পাক্ষিক সমালোচক।

প্রথম খণ্ড।

১২৯১ সাল।

—:•:—

সাহিত্য, সমাজ, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থব্যবহার,
রাজনীতি, পুরাতত্ত্ব, প্রভৃতি বিবিধবিষয়ক
পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন।

—:•:—

দ্বারভাঙ্গা ট্রেডিং কোম্পানীর

নিয়ন যন্ত্রে"; শ্রীনীরদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা ৴৩ আনা।

পাক্ষিক সমালোচক।

প্রথম খণ্ড।] সন ১২৯০ সাল, ফাল্গুন, দ্বিতীয় পক্ষ। [দ্বিতীয় সংখ্যা।

আমাদের অনর্থক অলস জীবন।

ঘড়ি ইংরাজের প্রাণ, আমাদের ক্রীড়া দেবা। ইংরাজের বক্ষে ক্ষুদ্রঘড়ি টুক টুক করিয়া শব্দ করিলে ইংরাজ বুঝে যে, ঘড়ির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরমায়ু কমিতেছে,—সেকেণ্ডের কাঁটা যত ঘুরিতেছে, অমনি ক'লের স্রোতে এই নশ্বরজীবন তত্ই ভাসিয়া যাইতেছে। সেই জন্যই ইংরাজ যাবদ্দিন বুকে ঘড়ি বাঁধিয়া কার্য্যক্ষেত্রে ছুটিতে থাকে এবং কত সময় গেল, মৃত্যু কত নিকটে আসিল, তাহা দেখিবার নিমিত্ত প্রতিনিয়ত ঘড়ি খুলিতে থাকে। বাহারও সহিত পাঁচটী কথা কহিতে হইলে তিনবার ঘড়ি খুলে। আমাদের বাবুগণের নিকট পিটিখের জুতা, ঢাকাই ধুতি, গর্ণেটের কোট, বা আলবার্টপ্রণালীর কেশবিন্যাস যেরূপ প্রয়োজনীয়, বদ্যপিও বা মেকেরের ঘড়ি চেনাবদ্ধ করিয়া রাখাও তদ্রূপ প্রয়োজনীয়। বিলাসিনীগণের কর্ণালঙ্কার ও কণ্ঠভূষণও যাহা, বিলাসিগণের বক্ষঃশোভিত ঘড়িও তাহাই;—শোভাভিন্ন অন্যকার্য্য দুইয়ের একেরও নাই। ইংরাজ ঘড়ির দিকে দৃষ্টি করিয়া জীবনক্ষেত্রের গন্তব্যপথে কেমন চলিতেছে তাহাই বুঝিতে থাকে, কতক্ষণ নিউটনের ন্যায়, আর্কিমিডিস বা রথচাইল্ডের ন্যায় ধনোপার্জ্জন করিবে তাহাই ভাবে, আমরা কতক্ষণ নিদ্রা যাই লাম, নাটক পড়িলাম বা পরনিন্দা করিলাম, ঘড়ির দিকে চাহিয়া তাহাই দেখি। ইংরাজের ক্লকঘড়ি চলিতেছে—সেখানে কার্য্যের অনন্তবিস্তার, হাতুড়ির দুম দাম, বয়লারের শোঁ শোঁ, ও এঞ্জিনের গড়্ গড়্ শব্দ হইতেছে, সেখানে সকলেই ধর্ম্ম জ্ঞানশূন্য হইয়া দেবশিল্পিবিশ্বকর্ম্মার আরাধনা করিতেছে, বাঙ্গালীর ক্লক্ চলিতেছে—বৈঠকখানায়, সেখানে চিরপটে মৎস্যবিক্রেত্রী-মাচ কুটিতেছে, নবীন এলোকেশীকে কাটিতে যাইতেছে, নায়ক নায়িকার অঞ্চল ধরিয়া কাঁদিতেছে। ক্লকের নীচে ঘরের কোনে ঝাঁঝরবুলা পড়িয়া আছে, এবং আমাদের গিয়রবাবুগণ "ধর মহলা," "মারো কিল্লি," "ছয় তিন নয়, "পোহা বারো" প্রভৃতি শব্দে মধ্যে মধ্যে গগন বিদীর্ণ করিতেছেন।

মনুষ্য ইহজগতে জন্মগ্রহণ করিয়া ৬০ বৎসরের অধিককাল প্রায়ই জীবিত থাকে না। তাঁহার জীবনের কার্য্য-বিভাগ করিলে দেখিতে পাই যে, প্রত্যহ আটঘণ্টা হিসাবে নিদ্রা গিয়া তিনি জীবনের তৃতীয়াংশ অর্থাৎ বাইটবৎসরের অন্ততঃ বিশবৎসরকাল নিদ্রিত ছিলেন। অবশিষ্ট চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ঐ রূপ হিসাবে অন্ততঃ চারিবৎসরকাল মলত্যাগে কাটিয়াছে এবং দশবৎসর স্নান ও আহার করিতে ব্যয়িত হইয়াছে;

এই রূপে প্রায় ৫০ বৎসরকাল অনর্থক নষ্ট হইয়াছে। কেবল স্বভাবের কার্য্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিতেই মনুষ্যের এত সময় নষ্ট হয়। অতএব যদি অবশিষ্ট সময়টুকু নিজের উন্নতিচিন্তায়, পরিবারবর্গের সুখ-বর্দ্ধনে, দেশের উন্নতি-সাধনে, ক্লিষ্টের ক্লেশাপনোদনে অথবা ঈশ্বরের আরাধনায় ব্যয় করি, তবেই এই ক্ষুদ্র মনুষ্যজীবন সার্থক। যে দেশের লোক এই সামান্য সময় এইরূপে অতিবাহিত করে, তাহারাই উন্নতির সোপানে আরোহন করে; কিন্তু যাহারা কেবল আহার নিদ্রাদি জান্তবকার্য্য ও বৃথাকথায় জীবন নাতিপাত করে, তাহাদের জীবন না থাকিলে কোনই ক্ষতি ছিল না।

সভ্যজাতি অসভ্যজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই জন্য যে, সভ্যগণ সময়ের মূল্য বুঝিতে পারে, অসভ্য পারে না। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠালাভ করিয়া এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডকে অলীক বলিয়া উপেক্ষা করেন এবং ঈশ্বর-প্রেমের ভূমানন্দ লাভ করিয়া এখানকার আর কিছুই চাহেন না, তাঁহাদের কথা বলিতেছি না; কেন না, ভারত যদি আজ সেই পূজনীয় প্রপিতামহগণের ধর্ম্মপদবী অনুসরণ করিতে পারিত, তাহা হইলে এরূপ প্রস্তাব লিখিবার আদৌ প্রয়োজনই হইত না। তাহা হইলে আজ ভারতের পঁচিশকোটী অধিবাসী সন্ন্যাসী সাজিয়া পঁচিশকোটী চিমটা হাতে করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে মুদিতনয়নে বসিয়া থাকিলে যে অপূর্ব্বদৃশ্য হইত, তাহার তুলনায় জগতের চাক-চিক্যশালী সভ্যতা কিছুই নহে। কিন্তু তাহা যখন অসম্ভব, পরলোকের চিন্তায় যখন জীবন কাটাইতে সমর্থ হইবে না, তখন হে ভারতবাসি! ইহজগতের সুখ স্বচ্ছন্দতা, ধন, বল, মান, সম্ভ্রম লাভের চেষ্টায় কেন বিরত থাক? তিনশত বৎসর কাল আমরা ইংরাজের নিকট শিখিতেছি যে, দান অপেক্ষা গ্রহণ প্রয়োজনীয়, পরলোক অপেক্ষা ইহ জগৎ সুখের, ঈশ্বর-চিন্তা অপেক্ষা শেল্‌ল্যাক্ ও ল্যাক্‌ডাই চিন্তায় ইষ্ট আছে, অংশতঃ এই উপদেশের অনুসরণেও প্রবৃত্ত হইয়াছি, তবে কেন পার্থিবসভ্যতা ও উন্নতির পরকাষ্ঠালাভে যত্নবান্ না হইব? নিরন্তর কার্য্য করিয়া অন্ততঃ ইহ-জীবনের কয়েক বৎসরকে কেন ধন্য না করিব? কিন্তু কতকাল পরে ভারতবর্ষ এই উপদেশের অনুসরণ করিবে তাহা কে জানে? ইংরাজ ও মার্কিন্ রাত্রিদিন খাটিয়া 'দৈবং নিহত্য' জগতের উচ্চস্থান অধিকার করিবেন বলিয়া সকলেকেই এই কথা শিখাইতেছেন যে, যাহারা মহৎ হইয়াছে তাহারা রাত্রি দিন খাটিয়াছে, "They, while their Companions slept, were toiling upwards in the night" আর আমরা বলি, 'নচ দৈবাৎ পরং বলং'— খাটিয়া আর কি হইবে? যদি অদৃষ্টে থাকে আপনিই ধনমান আসিবে। তাঁহারা বলেন 'Labor omnia Vincit' * আমরা বলি 'ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র'। তাই তাঁহারা রাত্রি তৃতীয়প্রহরের সময়েও আলোক জ্বালিয়া কার্য করেন, আর আমরা দিবা দ্বিপ্রহরের সময় দ্বারবন্ধ করিয়া নিদ্রাভিভূত হই এবং বৈকালে আরক্তচক্ষু হইয়া পৃষ্ঠে মাদুরের চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া নিদ্রোত্থিত হই। তাঁহাদের দেশে বহুলসংখ্যক সহর, সহরে লোকের ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি—সকলেই শশব্যস্ত আর আমাদের দেশে প্রায় সকলই পল্লীগ্রাম

* Labour conquers every thing.

পল্লীতে লোক নীরব, নিস্তব্ধ, নিদ্রিত—গ্রীষ্মকালের দিবা তৃতীয়প্রহরের জনশূন্য প্রান্তরবৎ। তাঁহারা Feverish activityকে সুখ বলেন, আমরা পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া থাকাকে সুখ জ্ঞান করি। আমাদের মেসোর খুল্লতাত-পুত্র অর্থোপার্জ্জনক্ষম হইলে তাহারই অন্নে প্রতিপালিত হই এবং কার্য্য করা অনাবশ্যক বিবেচনা করি, কিন্তু যে রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার রাজ্য কানাডা হইতে হংকং পর্য্যন্ত বিস্তৃত, যাঁহার রাজ্যে সূর্য্য কখন অস্ত যায় না,—তাঁহার পুত্র আজ ভারতে সামান্য কার্য্য করিতে আসিয়াছেন। তাই তাঁহারা আজি জগতের শ্রেষ্ঠজাতি এবং আমাদিগের প্রভু। যাহারা কয়েকশতবৎসর পূর্ব্বে বন্যজন্তুর ন্যায় আমমাংসভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিত এবং উলঙ্গদেহ বিবিধবর্ণে রঞ্জিত করিয়া একটা মৃগের অন্বেষণে সমস্তদিন ভ্রমণ করিত; অসীম উচ্চ আশা, নিরন্তর পরিশ্রম, অটল অধ্যবসায়ের গুণে আজি সেই ইংরাজ জাতি, জগতের আদি-সভ্য ভারতের অদৃষ্ট লুইয়া ক্রীড়া করিতেছে। আর আমরা ভারতবাসী পূজনীয় আর্য্যজাতির সন্তান হইয়াও কেবল কয়েক শত বৎসরের আলস্য ও ভাগ্যপরায়নতার দোষে সমস্ত জগতে ঘৃণিত, বিজেতৃগণের পদদলিত, কবির শোক-ময়ী ভাষায় আমরা—"দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত, জগতে সিংহের ঔরসে শৃগাল।" আজ যদি ভারতের সমগ্রলোক কৃষি, শিল্প ও বানিজ্যের উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হয় এবং জ্ঞানচর্চ্চা ও জীবনোপায়সংগ্রহ করিতে স্বাধীন ও নিরলসভাবে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে এই মৃতভারত পুনরায় জীবিত বলিয়া পরিচিত হইতেপারে।

পরমায়ু কি পদার্থ? ঐ যে অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ গলিত-অঙ্গ, পলিত-কেশ ও হীনদন্ত হইয়াছে অথচ জগতের কিছুই কার্য্য করেন নাই, এমন কি নিজেরও কিছুই উন্নতিসাধন করে নাই, যে বাষ্পীয়যন্ত্রের কার্য্য অথবা ঘড়ির স্পন্দন দেখিয়া ভূতযোনির কার্য্য বলিয়া ভীত হয়, যাহাকে পল্লীস্থ কয়েকটী লোক ভিন্ন আর কেহই চিনে না, কি করিয়া বলিব যে ঐ ব্যক্তি দীর্ঘজীবী? উহার জীবনের সকলই মরুভূমি, সকলই অসার ও নিরর্থক; কিন্তু পঞ্চম বর্ষীয় ধ্রুব ও প্রহ্লাদের নাম, ষোড়শ বর্ষীয় অভিমন্যুর নাম কেহ কি কখন বিস্মৃত হইতে পারিবে? চৈতন্যদেব ও ঈশা উভয়েই যৌবনে মরিয়াছেন, কিন্তু যতদিন মানব এ জগতে বিচরণ করিবে, ততদিনই তাঁহারা লোকের মানসসিংহাসনে বসিয়া প্রীতি ও ভক্তির পূজা পাইবেন, মৃত্যু কখনই তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। পাস্কাল, সার্ উইলিয়ম জোন্স ও মঙ্গোপার্ক যৌবনে মরিয়াছেন শুনিতে পাই, কিন্তু তাহারা খ্যাতির মন্দিরে যেরূপ বিরাজ করিতেছেন, কয়জন জীবিত ব্যক্তি তদ্রূপ করিতে সমর্থ? চতুর্দ্দিকে কোলাহল শুনা যাইতেছে যে, মহামনস্বী কেশবচন্দ্র সেন অল্পবয়সেই তনুত্যাগ করিলেন, কিন্তু যত দিন বাগ্মিতা ও ধর্ম্মসংস্কারের নাম জগতে বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন ইয়ুরোপ ও মার্কিন, ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়ায় কেশবচন্দ্রকে কেহ মরিতে পারিবে না। অথচ এই বঙ্গদেশেই কত কোটী কোটী লোক জন্মিয়াছে, বেড়াইয়াছে, বড় হইয়াছে, বৃদ্ধ হইয়াছে ও মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু স্বপ্ন যেমন নিদ্রাভঙ্গ হইলে কিছুই থাকে না, আজ সেইরূপ তাহা-

দের সত্তার কোন চিহ্ন নাই। কার্য্যই জীবনের আনন্দও, কার্য্যই পরমায়ুর পরিমাণ। যদি সমস্তদিন পরিশ্রম করিয়া কোন দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করিতে পার, তবে রাত্রিতে বসিয়া পরম সেই কার্য্যের প্রত্যেক অংশ তন্ন তন্ন করিয়া মনে করিবে, তখন দিনটীকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর বোধ হইবে এবং সমস্তদিনের প্রত্যেক অংশের সহিত এক একটী কার্য্য যোজিত থাকাতে সে দিনের জীবনকে সার্থক ও দীর্ঘ বলিয়া মন হৃষ্ট হইবে। পক্ষান্তরে সমস্ত দিন বিনাকার্য্যে ব্যয়িত হইলে দিনটীকে অসার, অনর্থক ও ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়, সে দিনের জীবন ও মরণ উভয়ই সমান। এই হিসাবে কার্য্য কুশল ব্যক্তির বিংশতিবৎসরের জীবন নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তির অশীতিবৎসরের জীবন অপেক্ষা অধিক জীবিত—অধিক পরম যুবিশিষ্ট। তাই বলিতেছিলাম যে কার্য্যই পরমায়ুর পরিমাণ। যে পরিমাণে জগতে তুমি নিজের বা পরের জন্য কার্য্য করিতে পারিবে, সেই পরিমাণেই তুমি জীবিত, সেই পরিমাণেই লোকে তোমাকে জীবিত বলিবে; আর যে পরিমাণে আলস্যের শান্তিময় ক্রোড়ে নিমীলিতনেত্রে নিদ্রিত থাকিবে, পরিবারবর্গের উপকার, দেশের হিতসাধন যে পরিমাণে বিস্মৃত হইবে, সেই পরিমাণে তুমি স্বর্গার্হ, নগণ্য ও মৃত। যাহারা অন্য কাহারও উপকার না করিয়া কেবল মাত্র নিজের জন্য কার্য্য করে তাহারাই জীবিতমনুষ্যের মধ্যে সর্ব্বনিকৃষ্ট, যাহারা নিজেরও ভাল করে না তাহারা জীবিতমনুষ্যের মধ্যে গণনীয়ই নহে তাহারা মৃত।

বহুবার করিয়া গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের এইরূপ মৃতব্যক্তিগণের গণনা করিয়াছেন। সমগ্রভারতের কথা ছাড়িয়া কেবল সভ্যতম বঙ্গদেশের অবস্থা দেখ। বিগত ১৮৮১ সালের লোকগণনায় বঙ্গদেশের অধিবাসিসংখ্যা প্রায় সাত কোটী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ন্যূনাধিক ২ কোটী নরনারী কাজ কর্ম্ম করে, বাঁধে, চাষ করে, গৃহকর্ম্ম দেখে অথবা চাকরি করে,—আর ৪ কোটী ৭৫ লক্ষ লোক অর্থাৎ দেশের প্রায় দশ আনা লোক কোন কাজ না করিয়া—সংসারধর্ম্ম, পরিবারপ্রতিপালন, অর্থোপার্জ্জন, দেশের উন্নতি কিছুরই জন্য চিন্তা না করিয়া—কেবল বন্ধন হইলে আহার করে এবং নিদ্রা যাইয়া তাস পিটিয়া, পরনিন্দা বা খোস গল্প করিয়া দুর্লভ মনুষ্যজন্ম কাটাইয়া দেয়। এবম্বিধ মনুষ্যশ্রেণী যে ভারতের অগ্রগণ্য জাতি, সেই ভারতের লোক গড়ে মাসিক ২০ দুই টাকা চারি আনা মাত্র উপার্জ্জন করে, লর্ড রিপণ এই হিসাব করিয়া আর কি আশ্চর্য্য দেখাইয়াছেন!

ইহাই বা আশ্চর্য্য কি যে, এরূপ অলসপ্রকৃতির জাতি চিরদরিদ্র, চিরদুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত হইয়া থাকিবে? এ দেশের লোকের শীঘ্রমৃত্যুর অন্য যাহাই কেন কারণ থাকুক না, আলস্য যে উহার প্রধানতম কারণ, তাহা বলিতে কেহই সঙ্কুচিত হইবেন না। যাহার অপদার্থ জীবন কোন কার্য্যই করিতে অগ্রসর হয় না সে কি রূপে দীর্ঘজীবী হইবার আশা করিবে? আবার জীবিত থাকিয়া পাছে কোন কার্য্য করিতে হয় এই ভয়ে অশেষবিধ বারবেলা কালবেলা যষ্ঠা, ত্রাহস্পর্শ, হাঁচি, টিকটিকি, বাধা, বিঘ্ন প্রভৃতি আপত্তি প্রস্তুত আছে। তোমা কোন স্থানে যাইতে ইচ্ছা নাই, কোন কার্য

করিতে প্রবৃত্তি নাই অথচ আত্মীয়গণ উত্তেজিত করিতেছে? ভয় কি? পঞ্জিকার আশ্রয় লও, দেখিবে দশপনর দিন মড়িলেও বিপদ—এমনই অবস্থা পঞ্জিকায় আছে। এমন দেশে যে অধিকাংশ লোক সাধু বৈষ্ণব ও ভিখারী হইবে, তবশিষ্ট ভূমিসাৎ, অসাড়ে নিষ্পন্দ দরিদ্র ও ঘৃণিত হইবে তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

এই অলসতা, এই দরিদ্রতা আমাদিগের জীবনের এই ভয়াবহ অসারতা—দূর করিবার উপায় কি? কি করিলে এই জাতিকে কার্য্য তৎপর ও সমৃদ্ধিশালী করা যায়? আমার জ্ঞানানুমোদিত কয়েকটী উপায় নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম উপায়—আমি বলি বাল্যকাল-বধি কার্য্যতৎপরতাশিক্ষা ও তাহার উপায় বিধান করা। বাল্যকাল হইতে বালকগণকে ব্যায়াম, দৌড়াদৌড়ি ও শারীরিক বলবৃদ্ধি করিতে উৎসাহ দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। যতদিন পর্য্যন্ত ভদ্রসন্তানগণ কষ্টসাধ্য কার্য্য করিতে অভ্যাস না করিবেন, তত দিন তাঁহাদিগের প্রকৃত উন্নতির কোন আশা নাই। দেশে ভদ্রলোক নাম ধারিশ্রেণীর কোন প্রকার শ্রমসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্তি না থাকাতেই তাঁহারা ক্রমেই হীনাবস্থ হইয়া পড়িতেছেন। যাঁহারা নিজ সন্তানগণের ভবিষ্যৎ মঙ্গলকামনা করেন, তাঁহারা নিজে চাকরীজীবি হউন বা নাই হউন সন্তানকে বাল্যকাল হইতে চাকরীর প্রতি ঘৃণা করিতে শিখাইবেন। চাকরীতে কিরূপে মনুষ্যমন নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, চাকরেরা রাত্রিদিন পরিশ্রম করিয়া কার্য্য করিতে কেন ইচ্ছা করে না, চাকরগণ অদ্যাপি কেন কোন উন্নতি করিতে পারিতেছে না এ সকল কথা বাল্যকাল হইতে না শিখাইলে উত্তরকালে স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করিতে ইচ্ছা হইবে না।

পক্ষান্তরে সময়ের মূল্য বুঝিতে শিক্ষা করা। প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিতে শয়নের সময় পর্য্যন্ত যত কায করিতে হইবে বা করিতে ইচ্ছা আছে, তাহার একখানি তালিকা করিয়া ঐ তালিকার নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে। বাল্যকাল হইতে এইরূপ অভ্যাস করিলে কাহারও আর তালিকার নিয়মানুসারী কার্য্য করিতে কষ্ট হইবে না। এই জন্য তিনটী কি মূল্যের ঘড়ি একটী একটী সকলের ঘরেই থাকা উচিত। বালিকা-গণকেও অল্পবয়স হইতে কার্য্যতৎপরা করিতে হইবে। ভারতের দ্বাদশ কোটী, বঙ্গদেশের সার্দ্ধত্রিনকোটী রমণী অজ্ঞান ও আলস্যের গাঢ়তিমিরে নিমগ্ন রহিয়াছে, কুসংস্কার ও বিলাসপ্রিয়তা তাহাদিগকে গ্রাস করিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের অধিক বিদ্যাবতী হইবার প্রয়োজন দেখি না; তাঁহারা যদি সাংসারিক কার্য্যে বিশেষ নিপুণতা লাভ করিতেন, তাহা হইলে এ দেশের লোকের সুখের সীমা থাকিত না। কিন্তু বর্ত্তমানসময়ে বাল্যকালে পিতামাতা বালিকাগণকে কিছুই শিখান না, যৌবনে স্বামী প্রাণপণ করিয়া তাঁহাদিগকে মূর্ত্তিমতী আলস্য ও 'বাবু' করিয়া তুলেন; সুতরাং ভারতীয় সংসারে অদ্যাপি পারিবারিকসুখ অতিঅল্পই দেখা যায়। অতএব যিনি নিজের কন্যাকে শ্বশুরালয়ে সকলের প্রিয়ভাগিনী করিতে চাহেন, তিনি প্রাচীন হিন্দুরমণীগণের ন্যায় তাহাকে বাল্যকাল হইতেই রন্ধন কার্য্য, গুরুজন ও আশ্রিতের প্রতি ব্যবহার, সাংসারিক কার্য্যের

বন্দোবস্ত, সন্তানপালন আয়ব্যয়স্থিতির হিসাব, গার্হস্থ্যচিকিৎসা, বালকবালিকার শিক্ষাদান সূচিকার্য্য প্রভৃতি শিক্ষা দিবেন। যিনি স্ত্রীর সাহায্যে সৌভাগ্যশালী হইতে ইচ্ছা করেন তিনি নিজে যে কার্য্য করেন, সহধর্ম্মিনীকে সেই কার্য্য শিখাইবেন। উভয়ের সমবেতচেষ্টায় উন্নতির স্রোত দ্বিগুণবেগে চলিবে। যাঁহার অবস্থা এত স্বচ্ছল যে পরিবার প্রতিপালন এবং দেশের প্রতি কর্ত্তব্যসাধন করিতে তাঁহার কিছুমাত্র অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন নাই, তিনি পরিবারস্থা রমণীগণকে বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রাদি শিখাইলেও ক্ষতি নাই, তত্রাচ সেখানেও রমণীগণের সাংসারিক কার্য্য জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু যাঁহারা নিজের সামান্য উপার্জ্জন হইতে ব্যয় করিয়া স্ত্রীকে আলস্যপরায়ণা করাই পরম সভ্যতা মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। সভ্যতম ইয়ুরোপও মার্কিনদেশে স্বামীর মাসিক দশসহস্র মুদ্রা আয় থাকিতেও যে সকল মহিলা রাত্রি দশঘটিকা পর্য্যন্ত স্বামীর সাবানের বা তৈলের কারখানায় স্বামীর সঙ্গে একত্রে পরিশ্রম করেন তাঁহাদের কথা শুনিলে এতদ্দেশীয় বাবুগণ বিস্মিত হইবেন।

জীবন-চরিত পাঠ করিলে লক্ষ উপদেশের ফল এক কথায় পাওয়া যায়, অলস জীবন কার্য্যপ্রবণ হয়, ভগ্নহৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়; সুতরাং যাঁহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা জাম-সেট্‌জি জিজিভয়, রথ চাইলড্, মতিশীল, কৃষ্ণপাণ্ডী প্রভৃতি মহাত্মাগণের জীবনচরিত পাঠ করুন। যশের উচ্চমঞ্চে আরোহন করা যাঁহাদের বাসনা, অতি হীন অবস্থা হইতে অত্যুচ্চ পদলাভ যাঁহাদিগের আশা তাঁহারা গ্লাডষ্টোন, ফিলড্, গারিবল্‌ডি প্রভৃতির জীবনী ও মার্কিন অভ্যুদয়ের ইতিহাস অধ্যয়ন করুন। তাঁহারা দেখিবেন যে, মনুষ্যের উন্নতির ইয়ত্তা নাই যত্ন করিলে মনুষ্য না পারে এমন কার্য্যই প্রায় নাই।

ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্পকার্য্য প্রভৃতির বৈজ্ঞানিকশিক্ষা এ দেশে যতদিন বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত না হইবে, ততদিন দেশের অধিকাংশ লোক নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিবে তাহাতে সন্দেহ কি? যদি কখন ইয়ুরোপীয় বাণিজ্যস্রোত ফিরাইয়া এতদ্দেশীয়গণ দেশজাতপদার্থ ব্যবহার করিতে পারেন, তাহা হইলেই এ দেশের লোকের হস্ত কার্য্য ব্যাপৃত হইবে, নতুবা ম্যাঞ্চেষ্টরের তন্তুবায়কুল ভারতবর্ষীয় তাঁতিগণের হস্ত যেমন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, তেমনি দিন দিন সকল কার্য্যেই ইংলণ্ড আমাদিগকে পরাভূত ও দরিদ্র করিয়া ফেলিবে। যে কেহ এই বিপদ-উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিয়াছেন, তিনিই বলিবেন, এদেশে পাশ্চাত্যপ্রণালীতে সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়বাণিজ্য শিক্ষা না দিলে ইয়ুরোপ ও মার্কিনের সহিত প্রতিযোগিতার উপায়ান্তর নাই। সুতরাং যাঁহারা ধনী হইতে ইচ্ছা করেন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনোপায় বিধান করিয়া তৃপ্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মানি এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের কারখানা ও ব্যবসায়প্রণালী তত্রস্থ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়া এতদ্দেশে আসিয়া তদ্রূপ শিক্ষা প্রদান করুন। গবর্ণমেণ্টের উপর ও এতদ্দেশীয় ইংরাজগণের উপর এ বিষয়ে একটুও নির্ভর করা যায় না। তাঁহারা কখন আমাদিগকে কাজের কথা শিখাইয়া স্বদেশের ক্ষতি করিবেন না। তাঁহারা গণিত

ও দর্শনশাস্ত্র এবং সাহিত্য ও ইতিহাস শিক্ষা দিতেছেন বটে, কিন্তু যাহাতে কোটী কোটী লোকের অন্নসংস্থান হয় এরূপ ব্যবসায়গুলি আপনাদের জন্য গুপ্তমন্ত্রের ন্যায় লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। জানি না, কতদিন পরে আমাদের হৃদয়ে এ কথা গভীররূপে অঙ্কিত হইবে, কতদিন পরে আমাদের ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নতির সম্যক উপায় বিহিত হইবে!

দ্বিতীয় উপায়—শারীরিক বলবৃদ্ধি। পরিশ্রম করিয়া ধনী ও যশস্বী হইতে অনেকের ইচ্ছা থাকিতে পারে, কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২০ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে পারেন এরূপ লোক ভারতবর্ষে কোথায়? অথচ কে না জানে যে, এরূপ পরিশ্রম করিলে নিতান্ত হীনাবস্থ ব্যক্তিও ধনমান লাভ করিতে পারে? দুর্ব্বলশরীর পরিশ্রমের কথায় ভীত হয় এবং ধনলাভের ইচ্ছা কৌশলে সফল করিতে চেষ্টা করে, সুতরাং সেই চেষ্টায় অনেকসময়ে অধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হয় এবং বিফলমনোরথ হইলে অদৃষ্টের নিন্দা করে। যে ভারতবর্ষের লোক দেশব্যাপী জ্বরে বৎসর বৎসর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, যাহাদের অধিকাংশ লোক দুই বেলা খাইতে পায় না সুতরাং নিতান্ত দুর্ব্বল, তাহারা যে নিজের অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে না, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু কি উপায়ে দেশব্যাপী ব্যাধি বিদূরিত ও শারীরিক বলবৃদ্ধি হয় তাহা সহজ নহে। দেশব্যাপী জ্বরসম্বন্ধে অদ্যাপি গবর্ণমেণ্ট প্রায় কিছুই সাহায্য করিলেন না; এক্ষণে দেশের লোক স্বয়ং ইহার কারণানুসন্ধান না করিলে আর উপায় নাই। আর শারীরিক বলবৃদ্ধি সম্বন্ধে ইহাই বলিতে পারি যে, আহারের উৎকর্ষসাধনই ইহার প্রধান উপায়। আহারের উৎকর্ষ বলিলেই মাংসভক্ষণ বুঝায় না। উদ্ভিদ্‌খাদ্যেও শরীর বলিষ্ঠ হইতে পারে। কিন্তু যেরূপ নিয়মে এক্ষণে অন্নভক্ষণ হইতেছে তাহা নিতান্ত হাস্যোদ্দীপক। পক্কবেলের শাঁস ফেলিয়া বীজভক্ষণ করিলে বিল্বফল মিষ্ট বোধ হইবে বিবেচনা করা যেরূপ অসঙ্গত চাউল সিদ্ধ করিয়া তাহার মাড় বা ফেণ ফেলিয়া দিয়া ভক্ষণ করিলে শরীরে বল হইবে ইহা প্রত্যাশা করা সেইরূপ ভ্রান্ত। যদি অন্নে কিছু শরীর গঠনোপযোগী মাংসিক প্রভৃতি পদার্থ থাকে, তাহা মণ্ডের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। অতএব মণ্ড না ত্যাগ করিতে হয় এরূপ উপায়ে অন্ন পাক হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ময়দা ও ছাতুভক্ষণ অধিক প্রচলিত হওয়া উচিত। যাঁহারা জান্তব রসায়নশাস্ত্র জানেন, তাঁহাদের উচিত যে, দেশমধ্যে ছাতু ও ময়দা ভক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন। ছোলার ছাতু মাংস অপেক্ষাও অধিক পুষ্টিকর এবং সুলভ পদার্থ, অথচ ঘোর মূর্খতাবশতঃ অদ্যাপি ছাতুভক্ষকগণকে অন্নভক্ষকেরা নিন্দা করেন। যদি কখন সমগ্র ভারতে বলবীর্য্যবৃদ্ধি করিয়া এ দেশের পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়, যদি কখন কার্য্যের নবস্রোত এ দেশে প্রবাহিত করা সম্ভব হয়, তবে ছাতুভক্ষণই তাহার প্রধান উপায় হইবে, ছাতু নিঃসন্দেহ রূপে ভবিষ্যৎভারতে প্রধান খাদ্য হইবে।

তৃতীয় উপায়—নগরে বাস। বড় বড় নগরে বাস করিলে নাগরিকদিগের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাঁহাদিগের ন্যায় সুখভোগের বাসনা জন্মে, এবং সেই লিপ্সাবশতঃ পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হয়। রাজধানীতে বাস করিলে বহুপ্রকারের লোকের সহিত সংঘর্ষণ ও

পরামর্শে কার্য্যের অনেক উপায় উদ্ভূত হয়; লোকের ব্যস্তভাবশতঃ কাহারও সহিত বসিয়া বৃথাগল্পাদি করিয়া সময় নষ্ট করিবার সুবিধা হয় না এবং স্বাধীনবৃত্তির লোক দেখিয়া ক্রমেই পরপিণ্ডোপজীবী হইতে ঘৃণা জন্মে। সুতরাং যাঁহারা আলস্যকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া ধনকুবের হইতে বা যশঃশৈলে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সর্ব্বদা বড় বড় নগরে বাস করিবেন। এ কথাটী অদ্যাপি এ দেশের লোক ভাল করিয়া বুঝেন নাই। বঙ্গদেশে শত করা ৫½ জন লোক সহরে বাস করেন, সমগ্র ভারতবর্ষে আরও কম, অবশিষ্ট সকলেই গ্রামবাসী, কিন্তু ইংলণ্ডে শতকরা ৮০½ জন লোক সহরবাসী—তাই ইংলণ্ড এত ব্যস্ত, এত উন্নত, এত ঐশ্বর্য্যশালী।

চতুর্থ উপায়—অলসদিগের প্রতি সামাজিক দণ্ডবিধান। যাঁহারা শরীরে সামর্থ্য থাকিতেও কোন কর্ম্ম না করিয়া স্ত্রীপুত্র-পিতামাতাকে কষ্ট দেন, তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করা অথবা তদ্রূপ অন্য কোন প্রকার দণ্ড দেওয়া উচিত।

পঞ্চম উপায়—সকলপ্রকার ব্যবসায়ও সকল প্রকার কার্য্যই উপযুক্ত হইলে সকলকে করিতে দেওয়া উচিত। যখন ব্রাহ্মণে জুতার দোকান করিলে, ধোপার কার্য্য করিলে অথবা সর্ষপতৈল প্রস্তুত করিলে নিন্দনীয় না হইবে—যখন মহাকুলীনগণ প্রয়োজনমতে ক্ষৌরকার্য্য করিতে, বস্ত্র-বয়ন করিতে অথবা বিচারপতির কার্য্য করিতে প্রস্তুত থাকিতে পারিবেন—যখন স্বামীর সহায়তার জন্য স্ত্রী শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবেন—যখন, ধর্ম্মনিরতা কন্যাকে ধর্ম্ম পথে থাকিয়া স্বদেশে কার্য্য করিতে অথবা দূরদেশে বাণিজ্যে যাইতে দিতে পিতা দুঃখিত না হইবেন—যখন ভারতবর্ষের স্ত্রী ও পুরুষ, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ সকলেই স্বীয় ও স্বজাতির উন্নতির জন্য ঈশ্বরাভিপ্রেত সর্ব্বপ্রকার শ্রম-সাধ্য-কার্য্য করিতে অগ্রসর হইবেন, তখনই ভারতে প্রকৃত কার্য্যস্রোত বহিবে, তখনই যথার্থ উন্নতি হইবে।

শ্রীযদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ।

শাস্ত্র সমন্বয়।

সকল শাস্ত্রই মান্য। অধিকারভেদে যাহাতে লোকের মঙ্গল হয়, সকল শাস্ত্রেরই সেই লক্ষ্য। এই লক্ষ্য স্মরণ না করিয়া যদি কোন শাক্ত বৈষ্ণবশাস্ত্রকে এবং কোন বৈষ্ণব তন্ত্রাদি শাক্তশাস্ত্রকে নিন্দা করেন, তবে তাদৃশ ব্যক্তিই মূঢ়। আমরা এমত সাহস করিয়া বলিতে পারি, যদি কেহ বেদান্তকে আদরপূর্ব্বক তন্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রকে হেয়জ্ঞান করেন, তিনিও মূঢ় শব্দের বাচ্য। যিনি প্রকৃত হিন্দু এবং ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি সর্ব্বদেবতাকে যেমন একমাত্র ব্রহ্মেতে সমন্বিত জানেন, সেইরূপ সর্ব্ব শাস্ত্রকে একমাত্র বেদেতে সমন্বিত দেখেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত যে নিগূঢ় সিদ্ধান্ত, তাহাই ধারণ করিয়া দ্বেষ, নিন্দা, ক্ষুদ্র-হৃদয়-দৌর্ব্বল্য, প্রভৃতি মহাপাপ হইতে দূরে স্থিতি করেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই বর্ত্তমানকালে বঙ্গভূমির কৃতবিদ্য নব্য সম্প্রদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য কিছুমাত্র না জ্ঞাত হইয়া ঐরূপ মূঢ়তা প্রকাশ করিতেছেন। কেহ বলেন দর্শনশাস্ত্রগুলি কতকটা পদে আছে, কিন্তু পুরাণগুলি নিতান্ত হাস্যাস্পদ; তন্ত্রশাস্ত্র-সমূহের ত কথাই নাই, তাহা অতি কুনীতিপ্রদর্শক। ফলে কেবল যে নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যেই আমরা এ দোষ দেখিতে পাই, এমত নহে। অনেক শাক্ত বৈষ্ণবশাস্ত্রকে এবং অনেক বৈষ্ণব শাক্তশাস্ত্রকে আজও একেবারে দখল দিতে চান না। এই বর্ত্তমান সময়ের উন্নত ব্রাহ্মেরা আবার কোন শাস্ত্রই মানিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু তাঁহাদের পিতা মহাত্মা রামমোহন রায় সকল শাস্ত্রকে সমভাবে সম্মান প্রদান করিয়াছেন।

আক্ষেপ এই যে, উক্ত মহাত্মার অভিপ্রায় গুলি কোন ব্রাহ্ম হৃদয়ঙ্গম করিলেন না। আমাদের এই সকল আক্ষেপ সৌভাগ্যক্রমে যদি মিটে, সেই উদ্দেশে নিম্নে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে বাধ্য হইলাম। লোকে মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে সৌভাগ্য মনে করিব।

বেদই একমাত্র সনাতনশাস্ত্র। তাহা অধিকারভেদে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই মার্গে বিভক্ত। উভয় মার্গই স্বাভাবিক। উভয়ই ঈশ্বরনিযন্ত্রিত। তাহা পূর্ব্বতন মহর্ষিগণের হৃদয়গত জীবন্ত ধর্ম্মের ও জলন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের আদর্শস্বরূপ। সত্যযুগে সেই ধর্ম্ম চারিপাদে পরিপূর্ণ ছিল। এইক্ষণ তাহার একপাদমাত্র অবশিষ্ট আছে। পূর্ব্বকালে যুগধর্ম্মবশতঃ যখন সেই জীবন্ত ধর্ম্ম বিনাশপ্রাপ্ত হইল, তখন অধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম কর্ত্তৃক জনসমাজ উচ্ছিন্ন না হইয়া যায়, এই উদ্দেশে ঋষিগণ লোকের অধিকার অনুসারে নানা শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। সেই সমুদয় শাস্ত্রকে আমরা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারি। যথা "বিধি" অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড, "ন্যায়" অর্থাৎ তর্ককাণ্ড, "অভ্যাস" অর্থাৎ যোগকাণ্ড এবং "অনুভব" অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ড। মহর্ষি জৈমিনিপ্রণীত কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদবিচার যাহা পূর্ব্বমীমাংসা নামে প্রসিদ্ধ আছে, আশ্বলায়ন গোভিল প্রভৃতি মহর্ষিপ্রণীত শ্রৌত, গৃহ্য ও সামাযাচারিক সূত্রগ্রন্থাবলি যাহা স্মৃতি বা কল্পশাস্ত্র নামে অভিহিত হয় এবং মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি মুনিগণপ্রণীত সংহিতাসমূহ যাহা স্মৃতিনিবন্ধ নামে কথিত হয়, সেই সমস্ত শাস্ত্র বিধি অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত। মহর্ষিগৌতমপ্রণীত ন্যায় এবং মহর্ষি কণাদপ্রণীত বৈশেষিক নামক পদার্থবিচাররূপ দর্শনদ্বয় তর্ককাণ্ডের অন্তর্গত। মহর্ষি কপিলপ্রণীত সাংখ্য ও মহর্ষিপতঞ্জলিপ্রণীত যোগ এই প্রাকৃতিক তত্ত্ব সংখ্যা ভেদাত্মিকা বিদ্যাদ্বয় অভ্যাস অর্থাৎ যোগকাণ্ডের মধ্যগত। এবং মহামুনি ব্যাসদেব প্রণীত জ্ঞান কাণ্ডীয় বেদবিচার যাহা উত্তরমীমাংসা নামে প্রসিদ্ধ আছে, তাহা অনুভব কাণ্ডের অন্তর্গত। এই "বিধি" "তর্ক" "অভ্যাস" ও "অনুভব বাদ" রূপ চারিপ্রকার শাস্ত্র হিন্দুধর্ম্মের চারিপ্রকার প্রস্থানস্বরূপ।

সংসারে লোকের অধিকার এবং ধারণাশক্তি নানা প্রকার। এখানে অধিকাংশ লোকই অদৃষ্ট অথবা স্বভাবাধীন কর্ম্মী। তাঁহারা স্বার্থবশে ও ফলকামনায় কর্ম্ম করিতে ভাল বাসেন। তাঁহারা ফল প্রত্যাশায় লৌকিক এবং বৈদিক উভয় প্রকার কর্ম্মেতেই আসক্ত। সত্যযুগে এই সকল কর্ম্মরূপ ধর্ম্ম জীবন্তভাবে সংসাধিত হইত। তখন ফলার্থিগণ জলন্ত ঈশ্বরকে ফলরাজ্যের বিধাতারূপে দর্শন করিতেন। তখন ফলরাজ্যের যে ভাগে এবং প্রবৃত্তির যে কোন শোভাসম্পদে পিতামহগণের আসক্তি নিপতিত হইত, সেই স্থানেই তাহার জীবন্ত অধিষ্ঠাতৃদেবতাস্বরূপে তাঁহারা পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইতেন। ঘটাবচ্ছিন্ন বা মঠাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায় তাঁহারা তখন সেই একই পরমেশ্বরকে প্রাকৃতিক শোভা ও সম্পদের বিভাগবিশেষে জীবন্তভাবে পরিচ্ছিন্ন দেখিতেন। তত্তদ্বিভাগানুসারে তাঁহাদের সকল জ্ঞানচক্ষে আদিত্য, সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, বিষ্ণু, রুদ্র, প্রজাপতি প্রভৃতি নামরূপে সেই একই ভগবান প্রকাশ পাইতেন। সেই একই ভগবান নানাদেবতারূপে তাঁহাদের প্রার্থনারূপ মন্ত্রারূঢ় হইয়া

তাঁহাদিগকে অভিলষিত ফলদান করিতেন। কিন্তু যুগ-ক্ষয় বশাৎ সেই জীবন্তধর্ম্ম বিনাশ প্রাপ্ত হইল। জনসমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট হইতে লাগিল। লোক সকল চতুর্দ্দিকে তার্কিক হইয়া উঠিল। অনেক লোক অলস ও নিরুদ্যম হইল। যখন কর্ম্মকাণ্ডে এতাদৃশ বিশৃঙ্খলা ঘটিল, তখন বহু অনুভব-সাধ্য জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিও যে শৈথিল্য জন্মিবে তাহার আশ্চর্য্য কি?

এইরূপে সেই পূর্ব্বকালে অভ্যুদয়ফলপ্রদ কর্ম্মকাণ্ড ও নিঃশ্রেয়সঃ ফলপ্রদ জ্ঞানকাণ্ডের সজীবভাব নষ্ট হইলে পরমকারুণিক মহর্ষিগণ কটিবন্ধন পূর্ব্বসব সেই ধর্ম্ম ব্রহ্ম প্রদ সনাতন বৈদিকধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত নানা উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, জনসমাজে এমন অনেকলোক রহিয়াছেন এবং পরেও থাকিবেন যাঁহারা ধর্ম্ম ক্রিয়া দ্বারা সাংসারিক ফল চান, কিন্তু তর্ক করিতেও ভাল বাসেন না, কৃচ্ছ্রসাধ্য যোগসাধনের দ্বারা শরীর, প্রাণ, বুদ্ধি, মন, বাহ্যপ্রকৃতি প্রভৃতিকে বশীভূত করিয়া আত্মকৈবল্যলাভ করিতেও ইচ্ছা করেন না, এবং জ্ঞান-প্রেম-বিশিষ্ট অনুভবসাধ্য ব্রহ্মজ্ঞানের ও অভিলাষ করেন না। তাঁহারা দেখিলেন যে, এই প্রকার তর্কবিমুখ, অভ্যাস-বিমুখ, জ্ঞানপ্রেমবিমুখ কর্ম্মিগণের সংখ্যাই অনেক। অতএব সেই প্রকার লোকেরা ঐ সকল দুর্গমপথে অথবা স্বেচ্ছাচারে ঘূর্ণায়মান না হইয়া যাহাতে কেবল সুনিয়মের বলে ধর্ম্মরক্ষণ করিতে পারে, সেই নিমিত্ত উপরি-উক্ত বিধিপর শাস্ত্রসকল প্রচার করিলেন। তাঁহারা কর্ম্মনিষ্পাদক সাক্ষাৎ বেদ ভাগ হইতে ঋষি, ছন্দঃ মন্ত্র, ও দেবতাসকল উদ্ধারপূর্ব্বক, এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট গোত্র ও শাখাপ্রচলিত গৃহ্যক্রিয়া সমস্ত সংগ্রহ ও তাহার মূলস্বরূপ শ্রুতিবাক্য সকল অনুমানপূর্ব্বক ক্রিয়াপদ্ধতি ও তদ্বিষয়ক বিচারগ্রন্থসকল প্রণয়ন করিলেন।

জৈমিনিপ্রণীত পূর্ব্বমীমাংসা ও অশ্বালায়নাদিকৃত শ্রৌতস্মার্ত্ত প্রভৃতি স্মৃতি সমূহ কেবল বিধিপরশাস্ত্রমাত্র। তাহা রাজাজ্ঞাবৎ প্রতিপালনীয়। প্রজাগণ দাসের ন্যায় হইয়া বিনাতর্কে, বিনাকষ্টে বিনা-অনুভবে তাহা পালন করিবেন। ইহাই উক্ত শাস্ত্রসমূহ প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য। এই বিধিপর শাস্ত্রানুসারে ক্রিয়া কর্ম্ম করা যেমন একদিকে সাংসারিক ও স্বর্গাদি ফলদায়ক, সেইরূপ অন্যদিকে উহাই ভারতসমাজের বন্ধন। উহারই অনুসরণ দ্বারা ভারতবর্ষে হিন্দুত্ব রক্ষা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের রাজারা পূর্ব্বকালে সংসারের মঙ্গল কামনায় এবং স্বর্গসাধনাভিলাষে ছোট বড় সমস্তপ্রজার সহিত একযোগ হইয়া ঐ সকল বিধি প্রতিপালন করিতেন। এখনও যে কেহ সংসারাশ্রমে থাকিয়া হিন্দুনাম রক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাকে অবশ্যই ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত বিধিপরধর্ম্মের সেবা করিতে হইবে। তাহাই করা তাঁহার প্রথম কার্য্য, কেননা তাহা রাজ-আজ্ঞার ন্যায় সাধনীয়। তাহা করিয়া তাঁহার যেমন প্রবৃত্তি তদনুসারে তার্কিক, যোগী, জ্ঞানী বা প্রেমিক হইতে হইবে। ইহাই অভিপ্রায়। গৌতম ও কণাদ দেখিলেন যে, সকলেই কিছু ঐরূপ নিরবচ্ছিন্ন দাসত্বে বদ্ধ থাকিতে পারিবে না। সকলেই যে যোগী বা ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারিবে এমতও নহে। অনেকে তর্কের দ্বারাই ঈশ্বর-তত্ত্ব অবগত হইবার অভিলাষী হইবে। এমত লোকেরা আপনাদের অধিকারানুরূপ

ধর্ম্ম হইতে পতিত না হয় এ জন্য উক্ত মহর্ষি দ্বয় পদার্থবিচারদ্বারা ঈশ্বর তত্ত্বনিরূপণ করিবার উপায়স্বরূপ ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শন প্রচার করিলেন। এই উভয় দর্শনে, ভগবৎ-প্রেমের বলে নহে, অপরোক্ষব্রহ্মজ্ঞানের বলে নহে, কিন্তু কেবল পদার্থবিচার ও অনুমানের বলে, কেবল যুক্তি ও যুক্তির বলে ঈশ্বরনিরূপণ করিবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ উপমান ও অনুমানের প্রণালী উপলক্ষ করিয়া ন্যায়শাস্ত্রকে আন্বিক্ষিকী শাস্ত্র কহা গিয়া থাকে। অর্থাৎ যে শাস্ত্রদ্বারা অনুমানের যোগে ঈশ্বর নিরূপিত হন তাহার নাম আন্বিক্ষিকী। এ দিকে কপিল ও পতঞ্জলি দেখিলেন যে, এমন অধিকারীও জনসমাজে থাকিবেন যাঁহারা নিয়ত দাসবৎ বিধির সেবা, তর্ক করিয়া সময় অতিবাহিত করা, অথবা জ্ঞানপ্রেমসমন্বিত ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ হওয়া মনোনীত করিবেন না, কিন্তু সাধনার দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, যোগাচরণ দ্বারা, যাহাতে প্রকৃতি ও প্রকৃতিজনিত ফলের আকর্ষণচ্ছেদপূর্ব্বক নির্ম্মল আত্মকৈবল্য লাভ করা যায় তাহাতে রত হইবেন। ইহা বিবেচনা করিয়া উক্ত মহর্ষিদ্বয় সাংখ্যজ্ঞান ও যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। কেবল সংখ্যাতত্ত্বের জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক পদ্ধতি অনুযায়িযোগসাধন করিতে পারিলেই আত্মকৈবল্যরূপ মুক্তিলাভ করা যায়। তাহাতে শ্রৌত বা স্মার্ত্তক্রিয়া সাধন, পদার্থবিচারদ্বারা ঈশ্বরনিরূপণ, বা জ্ঞানপ্রেম-সমন্বিত ব্রহ্মজ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না।

এই প্রকারে বিধিবাদী জৈমিনি ও স্মৃতিকারগণ, তর্কবাদী গৌতম ও কণাদ এবং অভ্যাসবাদী কপিল ও পতঞ্জলি বিভিন্নপ্রকার অধিকারীর রুচিদৃষ্টিতে হিন্দুশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান প্রচার করিলেন। কিন্তু মহর্ষি ব্যাস সমগ্রবেদের জীবন্তাৎপর্য্য ও প্রজাবর্গের অন্তরের উদ্দেশ্য টানিয়া বাহির করিলেন। তিনি দেখিলেন সমস্ত বেদ অবিভাগে যে পরমেশ্বরকে প্রতিপাদন করেন—সেই সর্ব্বসুখের নিদান আনন্দ-ময়কে পাইবার নিমিত্ত লোকসকল লালায়িত রহিয়াছে। তাহাকে না জানিয়া তাহারই উদ্দেশে বা তাহারই নিকটে ফল পাইবার প্রত্যাশায়, যাগ, যজ্ঞ ও ব্রতাচরণ রূপ বিধির সেবা করিতেছে। তাঁহাকেই পাইবার জন্য তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। তাহাতে সমাধিস্থ হইবার জন্যই যোগাভ্যাস প্রভৃতি তপস্যা করিতেছে। বেদেতে তাঁহারই গান, অন্তরে তাঁহারই টান। এমত ভগবানকে ভক্তিপূর্ব্বক অনুভব করিতে পারিলে সকলই সিদ্ধ হয়। অতএব বিধি-বিহিত সমস্ত কর্ম্ম তাহাতে অর্পণ করিবে, ভগবৎজ্ঞান ও তাহার প্রতি ভক্তির সহিত পদার্থবিচার করিবে, এবং তাহার দর্শন স্পর্শন সহকারে তৎস্বরূপে অবস্থান নিমিত্ত যোগাভ্যাস করিবে। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া বিধি, তর্ক ও অভ্যাসের শরণাপন্ন হওয়া বন্ধনমাত্র।

এই প্রকার দৃষ্টিতে ব্রহ্মবাদী মহর্ষি-ব্যাসদেব সকল প্রস্থানের সমন্বয়ার্থ "সমন্বয়", "অবিরোধ", "সাধন" এবং "ফল" এই অধ্যায়চতুষ্টয়যুক্ত ব্রহ্মমীমাংসা নামক বেদবিচারের প্রচার করিলেন। তিনি দেখিলেন বেদে রহিয়াছে "সর্ব্বেবেদা যৎপদ মামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তি, যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যমাচরন্তি, তত্তেপদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ"। সমস্ত বেদ একবাক্যে যে পদকে প্রতিপাদন

করে, সমস্ত তপস্যা যাঁহাকে নির্দ্দেশ করে, যাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া লোকে ব্রহ্মচর্য্য করেন, তিনি ব্রহ্ম। বেদের এই নিগূঢ় মর্ম্ম অনুসারে মহর্ষিব্যাস শারীরকে মীমাংসা করিয়াছেন "তত্তু সমন্বয়াৎ" ব্রহ্মতেই সকল বেদের সমন্বয়। "অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ" (১।২।১৮)। বেদে আছে "এষোঽন্তর্যামামৃতঃ" (বৃহদারণ্যকে) "তথা পৃথিব্যন্তরীক্ষাদিষু সর্ব্ববস্তুষু অন্তর্যামিত্ব উপদেশেন সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রতীয়তে।" পরমাত্মা অন্তর্যামি এবং অমৃত। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও সর্ব্ববস্তুতে তিনি অন্তর্যামিরূপে কথিত হন তিনি সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম। অধিদৈবাদি দেবপ্রতিপাদক বেদবাণি সকল সর্ব্বদেবে ব্রহ্মেরই অন্তর্যামিরূপ দেবত্ব প্রতিপাদন করেন। যেহেতু অমৃতাদি বিশেষণ ব্রহ্মভিন্ন অন্যকে নির্দ্দেশ করে না। অতএব ব্রহ্মই সর্ব্বদেবতা। "অসৌ বা আদিত্যঃ" এই পরমাত্মাই অচেতন সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্যামিরূপে আদিত্যস্বরূপে পূজনীয় হয়েন। কারণ মৃত-অণ্ডস্বরূপ অচেতন মার্ত্তণ্ডরূপ মাধিকাধারের পূজা নাই। "অনেন সর্ব্বগতত্ব মায়াশব্দেভ্যঃ" (১।২।৩)। বেদে আছে ব্রহ্ম সর্ব্বগত। সর্ব্বগতত্বরূপে সর্ব্বদেবে ব্রহ্মেরই দেবত্ব হয়। কিন্তু 'বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়ং' নামরূপ সমস্ত কেবল কথামাত্র, কেবল মায়ামাত্র! "সোঽকাময়ত বহুস্যাং" তিনি বহু হইবার কামনা করিয়া স্বকীয় মায়া বিস্তার করিয়াছেন। সুতরাং মাধিকশরীর সকল মিথ্যা হইলেও তৎসর্ব্বত্রে তিনিই দেবতারূপে পূজনীয়। মহর্ষিজৈমিনির উক্তি আছে "ফলপ্রদ স্বনেত্রে তৎকর্ম্ম নেশ"। কর্ম্মই (স্বনেত্রে কিনা স্বকর্ম্মকর্ত্রে) স্বীয় কর্ত্তাকে ফলপ্রদান করে; ঈশ্বর নহেন। জৈমিনির এতাদৃশ উক্তির নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মীর পক্ষে কর্ম্মকেই দেবতা জ্ঞান করা শ্রেয়ঃ। নতুবা অনুভব বিরহে তিনি ঈশ্বরকে বুঝিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহার নিমিত্ত 'ঈশ্বর" শব্দের উল্লেখ কেবল অনুমান উপন্যাস মাত্র। "ধর্ম্মং জৈমিনিরত্এব", অতএব জৈমিনির মতে ধর্ম্মই ফলদাতা। কেবল কর্ম্মিদিগের অধিকার দৃষ্টিতে এই উক্তির গ্রহণ হইবে। নতুবা ঈশ্বরই সর্ব্বকর্ম্মের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। বৈয়াসিক আচার্য্যেরা মীমাংসা করিলেন "কর্ম্মভিরারাধিত ঈশ্বরঃ ফলদাতা" (৩।২।৩৮) কর্ম্মসকল অচেতন। তদ্দ্বারা ফললাভ হয় বটে। কিন্তু ঈশ্বরই সে ফলের নিয়ন্তা। "সর্ব্বাপেক্ষাচ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ" (৩।৪।২৬) চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যজ্ঞাদি করিবেক। কেননা অশ্ব যেমন গৃহকে প্রাপ্ত করায়, যজ্ঞাদিকর্ম্ম সেইরূপ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ক্রমে ব্রহ্মনিষ্ঠা উদয় করিয়া দেয়। "বিধির্ব্বাধারণবৎ" (৩।৪।১৯) বেদে কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মনিষ্ঠ উভয়েরই স্তুতিপূর্ব্বক বিধি আছে, কিন্তু আসক্তিকর্ম্মীর ব্রহ্মনিষ্ঠা দুর্ল্লভ, অতএব ফলাসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে ক্রিয়া করিবেক। তাহা হইলে কর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ম্মত্যাগ উভয়েরই সামঞ্জস্য হইবে। "অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ" (৩।৩।৫১) সমস্ত দেবগণ বিরাটরূপিব্রহ্মের অঙ্গস্বরূপ এবং এবং মাধিকরূপবিশেষ, অতএব ব্রহ্মবিভূতি, ব্রহ্মমহিমা, এবং ব্রহ্মাবির্ভাবের উদ্দেশপূর্ব্বক দেবোপাসনা করিবে।

এইরূপে মহর্ষি ব্যাসদেব সমস্ত বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ডের সহিত সমন্বয় করিয়াছেন। এ সমন্বয় জ্ঞানিদিগের অধিকারেই সংলগ্ন হয়। অতএব ব্যাসের

সিদ্ধান্ত এই হইল যে, কর্ম্মিগণ যে ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত না হইয়া ক্রিয়া করেন সেই ঈশ্বরতত্ত্বই বামাকর্ম্মে প্রচ্ছন্নভাবে এবং নিষ্কামকর্ম্মে অনুভবসিদ্ধরূপে অবস্থিতি করেন। সুতরাং জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড উভয় প্রস্থানই এক ব্রহ্মেতে সমন্বিত। কেবল কর্ম্মী ও জ্ঞানীর দৃষ্টিভেদে প্রস্থানভেদমাত্র। ব্যাস ও জৈমিনি উভয়েই জনসমাজের কল্যাণকামী। অতঃপর মহর্ষি ব্যাসদেব দেখিলেন বেদে আছে ' নৈষাতর্কেণ মতি রাপনেয়া" ইা বহীমতি তর্কেতে প্রাপণীয়া নহে। তিনি এই শ্রুতি-অনুসারে নিম্নস্থ দুইটী সূত্র উত্থাপন করিয়া সাংখ্য ও ন্যায় পক্ষের শুষ্কতর্ককে খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানু-মেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষ প্রসঙ্গঃ।" (২।১।৭) তর্ক কেবল বুদ্ধিসাধ্য, এই হেতু তাহার প্রতিষ্ঠা নাই। তর্ক বেদের বাধা জন্মাইতে পারে না। যদি তর্ককে স্থির কহ, তবে শাস্ত্র সমন্বয় হয় না। সমন্বয়াভাবে মোক্ষ অসম্ভব। শাস্ত্রকে সমন্বয় করিবার চেষ্টা না করিয়া যদি কেবল তর্কের দ্বারা বিরোধ উৎপাদন করা যায়, তবে কপিল ও গৌতমাদি ঋষি-দিগের ধৃত মোক্ষেরও অভাব প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। অতএব কোন তর্কের প্রামাণ্য নাই। "এতেন শিষ্টাপরিগ্রহাঅপি ব্যাখ্যাতাঃ" (২।১।১২) শিষ্ট লোকে ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলেন। সেই হেতু পরমাণুকে জগৎকারণ বলিয়া ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন যে তর্ক করেন তাহা অবান্তর বিরোধ মাত্র। সুতরাং তাহা ত্যাজ্যরূপে শিষ্টসকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতাবতা ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী তর্কের গৌরব নাই। কিন্তু শ্রুতির অবি রোধী তর্কের দ্বারা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিবে। "জন্মাদস্য যতঃ' সূত্রেতে মহর্ষিব্যাসদেব তাদৃশ শ্রুতিবিহিত তর্ককে আদর করিয়া গিয়াছেন। যথা পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য উহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন, "সৎস্তু বেদান্ত-বাক্যেষু জগতো জন্মাদি কারণবাদিষু তদর্থ-গ্রহণদার্ঢ্যায়ানুমানমপি বেদান্ত বাক্য অবি রোধি প্রমাণং ভবন্নিরাস্যতে।" জগজ্জ-ন্মাদিকারণবাদী যে বেদান্তবাক্য, তাহাতে লোকের দার্ঢ্য থাকা বিধায় তদবিরোধী অনু-মানসকলও সহকারিপ্রমাণরূপে গৃহীত হয়। "শ্রুতের্ব সহায়ত্বেন তর্কস্য অপি অভ্যুপে-তত্বাৎ" শ্রুতিতেও তর্কসকল সহায়রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব তর্কের অনুরোধে তর্ক করিবে না, কিন্তু ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার সহায়-রূপে শ্রুতির অবিরোধী তর্ক আশ্রয় করিবে। এই দৃষ্টি স্থিরতর রাখিয়া পদার্থ বিচারপূর্ব্বক ঈশ্বর নিরূপণ করায় দোষ নাই। কিন্তু ভক্তিজ্ঞানপবিত্র ব্রহ্মানুভব ত্যাগ করিয়া চিরকাল ঘট, পট, পরমাণু লইয়া পাণ্ডিত্য-প্রকাশ করায় যেমন কোন লাভ নাই সেই প্রকার শুষ্কতর্কে ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা দিনপাত করিবেন, বোধ হয় গৌতম ও কণাদের এরূপ অভিপ্রায় ছিল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

চিত্তোদ্ভ্রান্তি; —নিশীথ অন্ধকার।

যা'স না যামিনি! হ'স না প্রভাত!
থাক্ চিরকাল অনন্ত আঁধার!
অনন্ত আঁধার ভালবাসি আমি।
অনন্ত আঁধারে ডুবে থাক্ সব!!

আঁধারে আমার হয় সুখোদয়,
আঁধারে আমার উথলে হৃদয়,
অনন্ত আঁধার ভালবাসি আমি।
থাক্ চিরকাল অনন্ত আঁধার!!

হ'সনা প্রভাত, হ'সনা যামিনি,
দিবালোক মম চোখের বিষ,
প্রাণ পুড়ে ছাই, হয় দিবালোকে,
ছিঁড়ে যায় মোর চিন্তার তার!

ভালবাসি আমি, যামিনি, তোমায়,
থাক এইরূপ হ'য়োনা ভোর,
ঘুমাইয়া থাক্ জীবের জীবন,
ভেঙোনাক ওই ঘুমের ঘোর!

আঁধারমাখান অনন্ত আকাশ!
একই ভাবেতে হউক প্রকাশ,
এইরূপ ফুটে থাক্ চিরকাল,
অনন্ত শূন্যেতে তারকাফুল!

গিয়েছে নিবিয়ে, থাকুক নিবিয়ে,
রবির কিরণ চোখের বিষ,
জীবনপ্রবাহ থাকুক থামিয়ে,
নিস্তব্ধ—নির্জ্জন—নীরব সব!!

সংসারের খর সমরবাজনা
বাজিছেনা আর কানের কাছে;
মানবের ঘোরতর প্রচণ্ডতা,
মোহ-মন্ত্র-মুগ্ধ হইয়া আছে!

চাইনা দেখিতে প্রকৃতির হাসি!
ভালবাসি আমি গম্ভীরমুখ,
আঁধার—গম্ভীর, আলোক—চঞ্চল;
আঁধারে—গম্ভীরে আমার সুখ!

নিস্তব্ধ নীরব থাকরে রজনি!
যেমন আছিস তেমন(ই) ভাবে;
অন্তরীক্ষ ব্যাপী বিধির উদ্যানে
তারাফুলগুলি গণি একে একে,

কেমনে গণির অসংখ্য তারকা?
গণির আবার, এক—দুই—তিন;
মুদিয়া নয়ন গণিতে কি পারি?
মেলিয়া নয়ন হয় না শেষ!

জানিস্ কি নিশি? বল্না আমায়—
তারাগুলি সব কেমনে হ'ল,
কোথা হ'তে এল, কেমনে ফুটিল,
কেমনে ওগানে ঝুলিয়া র'ল?,

পারি না কি আমি তারা হয়ে, ওরে,
ফুটিবারে ওই আকাশ'পরে?
কভু ভাবি মরে' তারা হ'য়ে যাই
ধরিগিয়া ওই তারার করে।

কি সুন্দর তারা! মরি কি সুন্দর!
দেখিনি সৌন্দর্য্য হেন অতুল!
বাসনা প্রাণের বলে, তুলে আন্
আকাশের ওই মাণিকফুল!!

অনন্ত আকাঙ্ক্ষা। কেমনে তুলিব?
ফুটে আছে ফুল উচ্চ'পরে,—
শক্তিহীন সাধ—বিষম বিধান!
কেমনে তুলিব? পাই না ভাবিয়া॥

শক্তি সীমাবদ্ধ—অনন্ত বাসনা,
বিধির এ বিধান কেমন(ই) হায়!
মিটিবেনা যদি হৃদয় পিয়াস
কেন সে আগুণ জ্বলে রে তায়?

ঠ, দ, ম।

একটী প্রণয়-সঙ্গীত।

"আমার মনোবেদনা কভু জানাইও না তায়;
শুনিলে বেদনা মম সে পাছে বেদনা পায়।
সে বাসে না বাসে ভাল, ভাল থাকে সেই ভাল,
শুনিলে তার মঙ্গল তবু ত প্রাণ জুড়ায়।" *

এটী আমোদপ্রিয় বিলাসী বঙ্গসমাজের একটী সাধারণ প্রণয় রীতি। যেমন কণ্টক জড়িত মৃণালে জনমনোহারিণী শতদলপদ্ম তেমনি অনঙ্গ-শর-পীড়িত কলুষপূর্ণ বাঙ্গালীর মুখে এই প্রণয় সংগীত। ইন্দ্রিয়াসক্ত বাঙ্গালীর মুখে ইহার অধিক পবিত্র গীত কেহ কখন শুনিয়াছে কি না জানি না, কিন্তু ইচ্ছা হয় সমস্ত গানের খাতা সর্ব্ব সন্তাপ-নাশিনী গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন করিয়া প্রতি প্রেমিকের হৃদয়ের স্তরে স্তরে এই গীতটী লিখিয়া রাখি। কবিতা এবং গীত হৃদয়ের স্বাধীন ভাবের উচ্ছ্বাসমাত্র, সুতরাং হৃদয়ে নহিলে আর এমন পবিত্র সামগ্রী কোথায় লিখিব? অনেকের মুখ বিলক্ষণ মিষ্ট বটে, কিন্তু সর্ব্বদা মুখমিষ্ট লোককে আমরা বিশ্বাস করিতে চাহি না—অনেকের মুখের সহিত হৃদয়ের মিলন নাই! মুখের কথায় আর আমরা ভুলিব না—বর্ত্তমান রাজ-পুরুষেরা আমাদিগকে বিলক্ষণ প্রবঞ্চনা করিয়াছেন।

যদি মনুষ্যহৃদয়ের কোন বৃত্তি পবিচালনা করায় সুখ থাকে, তবে সে বৃত্তি প্রণয়; যদি স্বর্গের কেহ পথপ্রদর্শক থাকে তবে সে প্রণয় প্রণয় ব্যতীত মনুষ্যের হৃদয়কে উত্তোলন করিতে আর কে সক্ষম? প্রণয়পাগল প্রসিদ্ধ ইংলণ্ডীয়কবি লর্ড বাইরণ বলিয়াছেন যে, প্রণয়ীর হৃদয়ে স্বর্গ স্বয়ং অবতীর্ণ হয়।—

"Devotion wafts the mind above,
But Heaven itself descends in love"

এ কথা প্রকৃতপক্ষেই সত্য। দেবারাধনায় মন উন্নত হইয়া স্বর্গলাভ করিতে পারে, কিন্তু প্রণয় ব্যতীত স্বর্গ আর কোথায় অবতীর্ণ হইতে পারে? স্বর্গ কি তাহা জানি না—এই মাত্র জানি যে, যে প্রণয়ে পবিত্রতা নাই তাহা স্বর্গের পথ-প্রদর্শক হইতে পারে না এবং সে প্রণয় প্রকৃতপক্ষে প্রণয়-পদবাচ্যই নহে। যে প্রণয়ে পবিত্রতা নাই তাহা প্রণয়ের ব্যভিচার মাত্র, সুতরাং যাহা

* গীতটী খাম্বাজরাগিণীতে মধ্যমানতালে গীত হইতে শুনিয়াছি।

ব্যভিচার তাহা সুখ শান্তি-প্রদ হইতেও পারে না। যাহার ব্যভিচার আছে তাহার প্রকৃত পদার্থ সহজলভ্য নহে, কেন না যাহা সহজ ও অনায়াসলভ্য আমাসস্বীকার করিয়া কেহই তাহার ব্যভিচার করিতে উৎসুক নহে। আবার পক্ষান্তরে যাহা কষ্টসাধ্য তাহারই বিস্তর ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে প্রণয়ে স্বর্গ অবতীর্ণ হইয়া থাকে, তাহা অনায়াসসাধ্য নহে, সুতরাং প্রণয়ে ব্যভিচার ও বিস্তর। এমন কি অনেকের মুখে অতি ক্ষোভ ও দুঃখের সহিত শুনা গিয়াছে যে বাঙ্গালিহৃদয় কেবল প্রণয়ের ব্যভিচারেই পরিপ্লুত। এ কথায় নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইয়াছি বলিয়াই আজ উপরোক্ত গীতটীর অবতারণা করিয়াছি।

এক পদার্থে অন্য পদার্থের সঙ্গতির নামকেই প্রণয় বলিয়া আমরা জানি। রাসায়নিক সংসক্তির গুণে যেমন একজাতীয় পদার্থ অন্য পদার্থের সহিত সহজে মিলিত হয়, সেই প্রকার প্রণয়ের গুণে এক হৃদয় অপর হৃদয়ের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়। সোহাগা যেমন একখণ্ড স্বর্ণকে অন্যখণ্ডের সহিত সংযুক্ত করে, প্রণয় তেমনই এক হৃদয়কে অপর হৃদয়ের সহিত মিলিত করিয়া দিয়া এক অপূর্ব্ব শোভনীয় অলঙ্কার প্রস্তুত করে। কি জড়জগতে, কি আধ্যাত্মিক জগতে, সর্ব্বত্রই এক পদার্থ অপর পদার্থকে আকর্ষণ করিয়া উভয়কে মিলাইয়া দিতেছে। সকলেই সকলের অনুরাগের জন্য প্রত্যহ প্রতি কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে। অতি ক্ষুদ্র মানবের জন্য সামান্য তৃণটী হইতে দেবাদিদেব মহাদেবের পর্য্যন্ত বিরাম আরাম নাই। মনের মত কর্ম্ম না হইলে শিশু রোদন করে, যুবক দুঃখিত হয় এবং বৃদ্ধ বিরক্ত হয়। পক্ষান্তরে তোমার মনের মত কর্ম্ম করিবার জন্য আমি তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আছি। ফল কথা এই যে, মনুষ্য প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে যাহা করে, তাহা অবশ্যই তাহার নিজের বা অন্যের মনোমত হইবে বলিয়া নিষ্পন্ন করে। মনুষ্যজীবনে এমন কোন কর্ম্ম নাই যাহার উদ্দেশ্য নিজের বা অন্যের সুখোৎপাদক নহে। অতএব প্রত্যেক কার্য্যেই আমরা দুইটী উদ্দেশ্য দেখি।

এই দ্বিবিধ কারণের মধ্যে যাহা অন্যের সুখান্বেষী তাহার আদর অধিক। আপনার মঙ্গলামঙ্গল ভুলিয়া যে পরের সুখের জন্য লালায়িত, সে দেবতা। আপনা ভুলিয়া পরের জন্য যে কাঁদিতে না শিখিল তাহার মনুষ্যভাব উদয় হইল না, সে চিরকালই পশুদিগের ন্যায় নিজের সুখান্বেষী হইয়া পশুভাবাপন্ন রহিয়া গেল। যীশু পরের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন বলিয়া লোকে যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে, আর চৈতন্য পরের জন্য কাঁদিতে শিখিয়াছিলেন বলিয়া চৈতন্য ভগবানের অংশ। আপনার জন্য ত পশুপক্ষীও পাগল, কিন্তু যে পরের জন্য আপনাকে না ভুলিল, তাহার পশুপক্ষী হইতে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যভাব কোথায়?

অন্যকে ভাল বাসিতে হইলে বিনামূল্যে আপনাকে বিক্রীত করা আবশ্যক। একেবারে স্বার্থত্যাগ করিয়া ভাল বাসিতে না পারিলে তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায় না; প্রতিদানের জন্য যে প্রণয় তাহাকে আমরা প্রণয়ের বিকৃতভাব বলি। হইতে পারে সে প্রকার ভালবাসাতে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার নামগন্ধও নাই কিন্তু তাহাকে নিঃস্বার্থ কি বলিয়া বলিতে পারি? সে ভালবাসাতে পবিত্রতা কোথায়? সে ভালবাসাতে সুখ

কোথায়? তাহাতে কেবল মনুষ্যত্ব ভিন্ন দেবত্ব কোথায়? কে কি প্রকার সুখ চাহে জানি না, কিন্তু আমাদিগের এই বিশ্বাস যে, যাহা যাহার প্রাপ্য, তাহাতে তাহার সুখের তৃষ্ণা নিবারিত না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু যে বৃত্তির পরিচালনায় কিছু প্রাপ্য নাই, তাহা পরিচালনার তারতম্য অনুসারে সুখপ্রদ হইতে পারে। যদিও সংসারে এ প্রকার নিস্বার্থ ভালবাসা অত্যন্ত দুর্লভ, কিন্তু যাহা ভাল তাহাকে কে ভাল বলিতে কাতর হইবে?

সচরাচর তিন প্রকার প্রণয় দেখিতে পাওয়া যায়। (১) তুমি আমাকে ভাল বাসিবে বলিয়া আমি তোমাকে ভালবাসি, (২) তুমি আমাকে ভাল বাসিয়া থাক সুতরাং আমি তোমাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না এবং (৩) তুমি আমাকে ভাল না বাসিলেও, তুমি আমাকে কখন না দেখিলেও এবং কখন আমার নামমাত্র শুনিবে এমন ভরসা না থাকিলেও আমি তোমাকে ভালবাসি। প্রথমটী পশুভাবের দ্বিতীয়টী মনুষ্যভাবের এবং তৃতীয়টী দেবভাবের দৃষ্টান্ত। তৃতীয়টীকে দেবভাবের দৃষ্টান্ত বলিবার কারণ এই যে, মনুষ্যের হৃদয়ে এ প্রকার প্রণয়ের ভাব উদয় হইলেই তাহারা সাধারণ মনুষ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া নূতন জগতে পদার্পণ করিয়া বিমল স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করে। এই প্রবন্ধের শিরোভাগে যে গীতটী মুকুটের ন্যায় শোভিত হইয়াছে, তাহা এই শেষোক্ত প্রকার প্রণয়পূর্ণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। সুতরাং গীতটী স্বর্গীয় রাগতালে রম্ভামেনকাদি অপ্সরাগণের কোমল কণ্ঠে সঙ্গীত হইবার সামগ্রী।

'আমার মনোবেদনা কভু জানাওনা তায়"——

আমি মরিয়া যাই, পচিয়া যাই, গলিয়া যাই, কিন্তু ভালরে ভাল তাহাকে আমার দুঃখের কথা তুমি কি জন্য বলিতে যাইবে? আমি মরি না কেন, আমার হৃদয়ে পাষাণ চাপাইয়া রাখ না কেন, আমার হস্তপদ বাঁধিয়া অগাধ-সাগর-সলিলে নিক্ষেপ কর না কেন, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহাকে আমার দুঃখের কথা বলা হইবে না। রণে, বনে, শ্মশানে আমি যথায় ইচ্ছা থাকি না, *আমি আপন ক্লেশ অকাতরে সহ্য করিব* কিন্তু আমি যে ক্লেশ পাইতেছি তাহা কদাচ তাহাকে বলা হইবে না। আমি যে ইহজীবনের সমুদায় সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছি, আশাভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া মূর্ত্তিমান যাতনা হইয়া বসিয়া আছি, তাহা যেন সে কখন শুনিতে পায় না। কেন না——

শুনিলে বেদনা মম সে পাছে
বেদনা পায়।"

আমার যাহা হয় হউক, আমি যে মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইতেছি তাহা পাইতে থাকি, তথাপি সে যেন তাহা না শুনে, কেন না আমার বেদনার কথা শুনিলে সে যে বেদনা পাইবে। আমি আপন ক্লেশ অকাতরে সহিব কিন্তু তাহার ক্লেশ সহ্য করিতে পারিব না, সুতরাং সে যাহাতে ক্লেশ পায় তাহা যেন কদাপি না হয়। তাহার সুখই আমার উদ্দেশ্য—আমার এই দুঃখের উপর তাহার দুঃখ আর সহ্য হইবে না। আমার যমযন্ত্রণা আমি অকাতরে সহিতে পারি, কিন্তু তাহার যে মাথা ধরিবে তাহা আমি সহিতে পারিব না। আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হউক না

কেন, কিন্তু তাহার যেন চরণে কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ না হয়।

যে ভাল বাসিতে শিখিয়াছে তাহার মুখে এই প্রকার কথা স্বর্গীয় বাক্য। যে ভাল বাসিতে জানে সে প্রণয়ীর অতি সামান্য ক্লেশের বিনিময়ে আপনার জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে পারে। সে কোন প্রকার প্রতিদানের আশা করে না। যে ভালবাসা কোন প্রতিদানের আশা রাখে না তাহা সংসারের অমূল্য কৌস্তুভরত্ন, নন্দন-কাননেও হয় ত তেমন বিমল, পবিত্র হৃদয়ানন্দদায়ক সুখ নাই। কিন্তু যে গানের কথা বলিতেছিলাম—

আমার ভালবাসা স্বার্থশূন্য। কেন না —

"সে বাসে না বাসে ভাল"

সে ভাল বাসিবে বলিয়া ত আমি ভাল বাসি না। সে আমাকে ভাল বাসিল আর না বাসিল তাহাতে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, সে দিকে আমার দৃষ্টি মাত্র নাই— আমার দৃষ্টি কেবল তাহার সুখের দিকে।

এ প্রকার বাক্য সামান্য হৃদয়ের বাক্য নহে। উদারচরিত্র ও প্রশস্তহৃদয় না হইলে এমন কথা বাহির হয় না। পৃথিবীর প্রায় ষোল আনা প্রণয়ই প্রতিদানের মুখাপেক্ষী, কিন্তু এ গীতটীতে সে প্রকার নিম্ন শ্রেণীর প্রণয়ের নামগন্ধও নাই। ইহাতে যে প্রণয়ের কথা আছে তাহা প্রণয়ের চরম উন্নত অবস্থা। সেই জন্যই বলি যে, গীতটী যেন প্রণয়িহৃদয়ের বীজমন্ত্র। মনুষ্য মাত্রই আপন সুখের জন্য পাগল—এই জন্য তাহার মনুষ্যভাব ঘুচিল না। আর পতিত-পাবনী জাহ্নবী সগরবংশের উদ্ধারের জন্য মর্ত্তে আসিলেন—তিনি দেবাদিদেব মহাদেবের শিরোভূষণ। গানটী বলিতেছে—

আমার অদৃষ্টে যাহা হয় হউক, আমি যন্ত্রণা পাইতে হয় পাইব কিন্তু তাহাকে ভালবাসিতে ছাড়িব না তাহাকে ভালবাসিব কিন্তু তাহার ভালবাসার প্রত্যাশায় নহে। আমার প্রত্যাশা এই, আমি চাই এই যে, সে—

"ভাল থাকে সেই ভাল"

আমি তাহার ভালবাসার কাঙ্গাল নহি, কেবল সে যাহাতে ভাল থাকে তাহাই আমার প্রার্থনা।

এমন কথা যে বলিতে পারে তাহার প্রণয়ই প্রকৃতপক্ষে পবিত্র প্রণয়। তাহার স্বার্থ ত্যাগই যথার্থ স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যদি আপনার সুখ ভুলিয়া অন্যের সুখের জন্য প্রাণ সমর্পণ করিতে না পারিলাম, তবে আর এ জন্মে পারিলাম কি? তবে আর আমার মহত্ব কোথায়? মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ব্রাহ্মণের সন্তোষের জন্য স্ত্রী পুত্র রাজ্য প্রভৃতি সমস্ত ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়াছিলেন তাই আজি তিনি প্রাতঃস্মরণীয়। অতিথি-সৎকারের জন্য কর্ণ আপন প্রাণসম পুত্রকে স্বহস্তে বধ করিয়াছিলেন সুতরাং তিনি সকলের পূজ্য। পরের জন্য যে কাঁদিতে শিখিয়াছে, আপন মুণ্ড স্বহস্তে ছেদন করিতে সে কখনই কুণ্ঠিত হইবে না। পরের সুখই যাহার ব্রত নীলকণ্ঠের ন্যায় হলাহল পান করিতে তাহার হস্ত কখনই পরাঙ্মুখ হইবে না।

সংসারে সুখই মনুষ্য-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সুখ দুই উপায়ে অর্জ্জিত হয় আপনার সুখে ও পরের সুখে। আপনার সুখে যে সুখ, তাহা কখনই স্থায়ী হইবার নহে। সুতরাং তাহা অপরিতৃপ্তও থাকিয়া যায়। কিন্তু পরের সুখে যে সুখ তাহার অস্তিত্ব তত দিন, যত দিন চন্দ্রসূর্য্য-

বিরাজিত সংসার জীবকুলের আবাসস্থল এবং যত দিন আমি সেই অসংখ্যজীবকুল-সাগরের এক সামান্য বালুকাকণা। অতএব যদি কিছু এই নশ্বর সংসারে স্থায়িসুখ থাকে তবে সে সুখ প্রণয়পাত্রের সুখে, সে সুখ যাহার সুখের জন্য আপন মুণ্ড আপনি ছেদন করিতে পারি তাহার সুখে।

আমি স্বয়ং রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা পাই না কেন তাহাতে কোন ক্ষতি নাই,

"শুনিলে তার মঙ্গল তবু তে
প্রাণ জুড়ায়।"

শোক-তাপ পূর্ণ সংসারে দাঁড়াইবার স্থল কেবলমাত্র তাহার মঙ্গল ও তাহার সুখ। তাহার সুখমাত্র অবলম্বন করিয়া দুঃখপূর্ণ সংসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা। সে হাসিলে হাসিব, সে কাঁদিলে কাঁদিব এই যখন আমার জীবনের লক্ষ্য তখন যাহাতে সে সুখে থাকে তাহাই আমার কর্ত্তব্য; কেন না তাহা হইলে আমার সুখও অক্ষুন্ন থাকিবে। যাহাতে তাহার অসুখ তাহা কদাপি আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু আমার মনোবেদনা জানিতে পারিলে সে ক্লেশ পাইবে, তাই আবার গাইতেছি, তোমাদিগের হাতে ধরিয়া বলিতেছি

"আমার মনোবেদনা কভু জানাইও
না তায়; শুনিলে বেদনা মম
সে পাছে বেদনা পায়।"

অশ্লীলতাপূর্ণ, অপবিত্রতাপূর্ণ এবং কুরুচিপূর্ণ বিরহসঙ্গীতের পরিবর্ত্তে এই আদর্শ বিরহসঙ্গীত বঙ্গসমাজে কত দিনে গীত হইবে তাহা বিধতাই জানেন! কিন্তু কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি যে, যাঁহারা সঙ্গীত-বিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই প্রকার গীতকে আদর্শ করিয়া গীত রচনা ও গান করিবেন। যে সকল সাধারণ গীত শুনিয়া লোকে সমস্তজাতির চরিত্র বুঝিয়া থাকে, তাহা যে কতদিনে এই প্রণালীর গীত হইবে, তাহা কেবল যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই বলিতে পারেন।

সিঃ।

সারসংগ্রহ।

মাসিক পত্র।

বিজ্ঞান দর্পণ—অগ্রহায়ণ, ১২৯০। ২য় ভাগ—৮ম সংখ্যা।

১। মানবতত্ত্ব। শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত মানবতত্ত্ব গ্রন্থের বিস্তারিত সমালোচন। সাধারণতঃ কতকগুলি মতের সমালোচনা করিয়া মানবতত্ত্বে যে যে বিষয় আলোচিত হইয়াছে, সমালোচক তাহার কিয়দংশের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন।

২। মধুমক্ষিকা। (শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ বসাক, বি, এ)—পূর্ব্বপ্রকাশিতে পর। মধুমক্ষিকাদিগের নিদ্রা, ভবিষ্যৎ দুর্যোগ অবগত হইবার ক্ষমতা, উপনিবেশ-সংস্থাপন ও তাহা করিবার প্রয়োজন ও স্থান, তাহাদিগের অস্ত্র বা হুল, হুলের প্রকৃতি ও ব্যবহার এবং হুলফুটানর জ্বালা ও স্ফীততানিবারণের জন্য কয়েকটী ঔষধ

—এ সংখ্যায় এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

৩। আর্য্যজাতির ন্যায়শাস্ত্র। (শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন সেন গুপ্ত)—পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর। দ্রব্যের সহিত গুণ বা গুণও কর্ম্ম সংশ্লিষ্ট হইবার যৌক্তিকতা; বেদান্তমতে গুণের অবাস্তবত্ব; গুণ ও দ্রব্যের অন্যোন্যাশ্রিত হওয়াতে ইয়ুরোপীয়মতে ন্যায়শাস্ত্রে যে দোষ পড়ে তাহার খণ্ডন, দ্রব্য ও গুণ কত প্রকার, কর্ম্ম কি ও কতপ্রকার; জাতি, বিশেষ, সমবায় ও অভাবকে পদার্থ মধ্যে স্বীকার করাতে তাঁহাদিগের লক্ষণ; অভাব —সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব, এবং তিন প্রকার সংসর্গভাব—এই সকল বিষয় ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। তৎপরে জাতি, বিশেষ, সমবায় ও অভাবকে পদার্থমধ্যে গণ্য করাতে ইয়ুরোপীয়দিগের আপত্তিরও খণ্ডন করা হইয়াছে।

৪। উদ্ভিদ্‌জীবন প্রক্রিয়া। (শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন মুখোপাধ্যায়)—পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর। উদ্ভিদের উপযুক্ত আহার পাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শিকড়ের উদ্ভব এবং কোন এক জাতীয় উদ্ভিদ্ আহার অভাবে মরিয়া গেলে তাহার স্থানে সেই জাতীয় উদ্ভিদ্ জন্মিবার অযৌক্তিকতা বিবৃত করিয়া কি প্রকারে উদ্ভিদ্‌দিগের রস সঞ্চালিত হয় এবং রস-সঞ্চালন জন্য যে নলি হয় তাহা কি প্রকার—এই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে।

৫। জড়জগতের নিয়ম আকর্ষণ। (শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়) এই প্রবন্ধে জড় কি, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা এবং আকর্ষণই তাহাদিগের সকলের সাধারণ ধর্ম্ম, এই সকল বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এই আকর্ষণ—আণবিকর্ষণ, কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি এবং যোগাকর্ষণ—কি প্রকার এবং স্থান-বিশেষে কি প্রকার হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ আছে।

৬। তত্ত্বসংগ্রহ। কয়েকটী পীড়ার সহজ ঔষধ, জল পরিষ্কৃত করিবার উপায়, বস্ত্রাদি দগ্ধ না হইবার কৌশল ইত্যাদি ইত্যাদি।

৭। সহচরী—বিজ্ঞানদর্পণের ক্রোড় পত্রিকা। ইহাতে, দেওয়ান গোবিন্দরাম' ও 'মধুযামিনী' নামক দুইটী উপন্যাসের কিয়দংশ, এবং 'সঙ্গীতে রমণীহৃদয় পুরুষ কর্ত্তৃক কতদূর চিত্রিত হইয়াছে,' বাবু বীরেশ্বর পাঁড়ের 'অদ্ভুত স্বপ্ন'—এই প্রবন্ধদ্বয়েরও 'মহীরাবণ কাব্যের'ও অল্পাংশমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রবাহ—মাঘ, ১২৯০। ২য় ভাগ—১০ম সংখ্যা।

১। শৈশব মৃত্যু ও পীড়া। (শ্রীযুক্ত সার্জ্জন ধর্ম্মদাস বসু, এল্ আর, সি, পি; এল্, আর্, সি, এল্)—পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর। কলিকাতার স্বাস্থ্যবিষয়ক বিবরণের কয়েকটী তালিকা হইতে কি পীড়ায়, কত শৈশব মৃত্যু ঘটে তাহা দেখাইয়া কতকগুলি কারণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—রোগের অনভিজ্ঞতা, সামাজিক অবস্থা মন্দ বলিয়া চিকিৎসার অভাব, দুর্ভিক্ষ এবং শস্যাদির অপ্রতুলতা, শীতাধিক্য, পিতা মাতার অজ্ঞতা ও কুসংস্কার, গৃহের বায়ু সঞ্চালনোপায়হীনতা, শরীরের অপরিচ্ছন্নতা, অযথা সামগ্রী আহার ইত্যাদি। শিশু কি প্রকার পরিচ্ছদ ব্যবহার ও কখন কি আহার করিবে তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

২। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের পরলোক গমনে—পদ্য। (শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গঙ্গোপাধ্যায়)

৩। কি লিখিব? (শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র

সিদ্ধান্ত)। না জানিয়া, না বুঝিয়া এবং না ভাবিয়া প্রবন্ধ লিখিলে কিপ্রকার সামগ্রী হয় ইহাতে তাহার ব্যঙ্গসূচক চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন কোন সংবাদপত্রকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগের অসারতার দিকেও তীব্র দৃষ্টি করা হইয়াছে।

৪। বিদ্যুল্লতা—উপন্যাস। (শ্রীযুক্ত "জয়চাঁদ") চতুর্ব্বিংশ, পঞ্চবিংশ ও ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

৫। ভ্রমণ বৃত্তান্ত। (শ্রীযুক্ত পরেশনাথ দাস)—কাশী। এলাহাবাদ হইতে কাশী গমন কাশীর বিবরণ, তথাকার তীর্থ ও আচার ব্যবহারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

৬। ভগ্ন হৃদয়—পদ্য। (শ্রীযুক্ত পঃ)।

৭। মায়া। (শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গঙ্গোপাধ্যায়)। এ প্রবন্ধে মায়াবৃত্তির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। লেখক বলিয়াছেন "স্বার্থ ও সহবাসেই যে এ বৃত্তির পরিপোষণ, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই" এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

৮। মা ও মেয়ে—উপন্যাস। (শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায়)। তৃতীয় পরিচ্ছেদ।—এই সংখ্যায় ইহা সমাপ্ত হইয়াছে।

৯। খাদ্যোৎপুঞ্জ। (শিল্প-বিজ্ঞান-সাহিত্য-ইতিহাস-রহস্য-বিদ্রূপ-কণিকা) নিম্নলিখিতগুলি, দুই মুখো মেয়েমানুষ, ইভ্ ফ্রিগেন, কেশের স্পর্শজ্ঞান, দন্তরোগ, এবং ভূ-পোত—এই কয়টী বিষয় আছে।

১০। সম্পাদকীয় উক্তি। মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেনের মৃত্যুর সংবাদ।

১১। গ্রন্থাদির উল্লেখ, সমালোচন ও প্রাপ্তি স্বীকার। (১) কিরণ—মাসিক পত্র, (২) বঙ্গবীরচরিত, (৩) শ্মশান ও জীবন, (৪) ভার্গব বিজয় কাব্য, (৫) মন্দারকুসুম এবং (৬) The Voice of India. বেঙ্গল থিয়েটর (ব্রজলীলা নাট্যগীতিকাভিনয়) ও ন্যাশনাল থিয়েটর (ম্যাগবেথাভিনয়।)

নব্যভারত—মাঘ, ১২৯০। ১ম খণ্ড ৯ম সংখ্যা।

১। আনন্দমঠ। (শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়)। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমবাবুর সুপ্রসিদ্ধ আনন্দমঠ সমালোচিত হইয়াছে। সমালোচক মূলগ্রন্থের অনেকগুলি দোষ দেখাইয়া দোষ ও গুণের বিচার করিয়াছেন।

২। বাল্মীকি ও বেদব্যাস (শ্রীগোপীচন্দ্র সেন)—দ্বিতীয় অংশ। বহুতর গ্রন্থ অন্বেষণ করিয়া লেখক বাল্মীকি ও বেদব্যাসের কাল নির্ণয় করিতেছেন।

৩। ভক্ত কেশবচন্দ্র। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জীবনীতে বিশেষত্ব আছে এবং তাহার আলোচনায় কি শিক্ষা লাভ করা যায়, লেখক এই প্রবন্ধে তাহাই দেখাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে "হরির ভিতর দিয়া যাঁহারা দেখিবেন, তাঁহারাই হরিভক্ত কেশবচন্দ্রকে উপযুক্তরূপ চিনিতে পারিবেন।"

৫। কেশবচন্দ্র—(পদ্য)। শ্রী বঃ)।

৫। শাক্যচরিত, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধদর্শন (শ্রী ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম্, এ)—তৃতীয় প্রস্তাব, পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর। বৌদ্ধ গ্রন্থ ও তাহার ভাষার বিষয় বিবেচিত হইয়াছে। বৌদ্ধ গ্রন্থ সকলের শ্রেণীবিভাগের কথা উল্লিখিত এবং প্রত্যেক শ্রেণীর কতকগুলি করিয়া পুস্তকের নামও প্রদত্ত হইয়াছে।

৬। নবলীলা উপন্যাস। শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

৭। জীবন বিজ্ঞান। (শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়, বি,এস,সি)। জড় ও জীবের প্রভেদ

প্রদর্শিত করিয়া জীবদেহ ও তাহার কার্য্য অনুসারে জীবনবিজ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের কার্য্য কি, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জীবনবিজ্ঞানের অপর ভাগ জরায়ু-বিজ্ঞান। জীবনবিজ্ঞানের আলোচনা পদ্ধতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া প্রবন্ধ আপাততঃ শেষ করা হইয়াছে। সে পদ্ধতি পরিদর্শন ও পরীক্ষা।

৮। লোক সংখ্যা। (শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়) পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর। আর্য্যভূমিতে পূর্ব্বকালে বংশ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান কালে সেই নিয়ম অনুসরণ করাতে অন্নাভাব যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্নাভাব নিবন্ধন কি অনিষ্ট উৎপন্ন হয় তাহার প্রথম কয়েকটীর উল্লেখ করা হইয়াছে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ।

কলিকাতা মহামেলা। মিঃ জোবার্ট সাহেব বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে কলিকাতায় যে মহামেলার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই একটী অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। যেরূপ চমৎকার নিয়ম এবং পারিপাট্যের সহিত পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের মহামূল্য এবং উৎকৃষ্ট শিল্পজাত দ্রব্যাদি একস্থানে রক্ষিত এবং সজ্জিত হইয়াছে, তাহা দর্শন করিয়া বাস্তবিকই মোহিত হইয়া যাইতে হয়। আমরা ভারতবাসী, আমরা কখন এরূপ দৃশ্য দেখি নাই; সুতরাং যে ব্যক্তি অসাধারণ পরিশ্রম এবং ব্যয় স্বীকার করিয়া ভারতবর্ষে এমন আশ্চর্য্য ব্যাপারের সংঘটনা করিয়াছেন, তিনি যে আমাদিগের শতসহস্র ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

কিন্তু যখন এই মহামেলা হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, তখন বলা হইয়াছিল, যে ভারতবর্ষীয় লোকসাধারণের উপকারার্থ—তাহাদের জ্ঞান এবং বুদ্ধির উন্নতিসাধন করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট আপন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই; এক্ষণে আমরা যদি ইহা হইতে কিছু শিক্ষা করিতে পারি এবং সেই শিক্ষার জন্য দেশের কোন প্রকার উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হই; তবেই গবর্ণমেণ্টের এই অসীম যত্ন সফল হইবে, নচেৎ সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতিস্বরূপ বলিতে হইবে।

শুনিতে পাওয়া যে, সর্ব্ব প্রথমে ইংলণ্ডে যখন এইরূপ একটী মহামেলা হয়, তাহার অব্যবহিত পর হইতেই ইংলণ্ডের আভ্যন্তরিক অবস্থার অত্যন্ত উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ভারতবর্ষে কি এরূপ ফল হইবে না? আমরা যেরূপ উদাসীন, আমরা যেরূপ বৃথামোদপ্রিয়, আমরা যেরূপ অলস এবং নিস্পৃহ, তাহাতে ত বড় কিছু ভরসা হয় না। মেলা হইতে প্রত্যাগত অনেক ব্যক্তিকে এক এক করিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, যে "বল ভাই, মেলা দেখিয়া কি শিখিয়া আসিলে?" সকলেরই নিকট হইতে কিন্তু আমরা একই ভাবের উত্তর পাইয়াছি—"শিখি নাই কিছু! শিখি-

বার কিছু যো নাই; কিন্তু তামাসা অতি চমৎকার! এমন তামাসা আর কখন দেখি নাই!" আমাদের ভয় হইতেছে যে, এই বৃহৎ ব্যাপারটা বুঝি অবশেষে আমাদের পক্ষে কেবলমাত্র তামাসাতেই পরিণত হইল!

কিন্তু ভারতবাসী ইংরাজ এবং ইয়ুরোপীয়দিগের পক্ষে ইহার ফল সম্পূর্ণ বিপরীত। সম্বাদপত্রে দেখিলাম, যে কলিকাতাস্থ কয়েকজন ইংরাজ বণিক, অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থে এখন হইতেই জাহাজ নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কই, আমাদের দেশের একটি লোককেও ত এ পর্য্যন্ত অঙ্গুলি উত্তোলন করিতেও দেখিলাম না! কেবল রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর খুব এক ভোজ দিয়াছেন! আর দুই চারি জন অন্যান্য রাজা মহারাজারা দশহাজার, বিশহাজার মূল্য দিয়া দুই চারিটা দ্রব্য ক্রয় করিয়াছেন! কিন্তু কেবলমাত্র ভোজ খাওয়াইলে কিম্বা বিলাসপ্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করিলে কি ভারতবর্ষের উদ্ধারসাধন হইবে?

ভারতবর্ষ আজকাল এত দুর্দ্দশাপন্ন, কিন্তু তথাপি ভারতবর্ষ বাস্তবিকই স্বর্ণভূমি। মেলার মধ্যে 'ইণ্ডিয়ান কোর্ট' নামক যে অংশ আছে, তাহাতে ভারতবর্ষের শিল্প এবং কৃষিজাত এত অসংখ্যাসংখ্য প্রকার দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে ভারতবর্ষকে কখনই অজ্ঞ এবং দরিদ্র দেশ বলিয়া বোধ হয় না। মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী উৎকৃষ্ট রকমের অনেক জিনিষ, ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইয়া থাকে; কেবলমাত্র বিস্তারিত বিনিময় এবং যথেষ্ট উৎসাহের অভাবে, সে সমস্ত জিনিষ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেনা। দেশের লোকের চেষ্টা নাই, উদ্যম নাই, কার্য্যতৎপরতা নাই সকলেই উদাসীন, পরমুখাপেক্ষী এবং পরবুদ্ধিচালিত। অর্থের কমি নাই; মূলধনের অভাব নাই, কিন্তু দেশের অধিবাসিগণ মহানিদ্রায় অভিভূত। অন্য লোক আসিয়া আমাদেরই মূলধন লইয়া প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া চলিয়া যাইতেছে; আর আমরা বসিয়া বসিয়া তাহাদেরই দাসত্ব করিয়া অতি সন্তুষ্টচিত্তে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি! ইহার অপেক্ষা আর কিছু কি অধিক শোচনীয় হইতে পারে? প্রত্যহ ইয়ুরোপীয় জীবনের উদ্যমশীলতা এবং কার্য্য তৎপরতার সম্মুখীন হইয়া, তৎপরে এই মহামেলা সংসৃষ্ট অদ্ভুত ব্যাপার সমস্ত স্বচক্ষে দেখিয়াও যদি আমাদের মৃতপ্রাণে একটুও জীবন সঞ্চারিত না হয়, আমাদিগের জড়ীভূত দেহে একটুও সজীবতার আবির্ভাব না হয়, তবে আমাদের আশা নাই!

জাতীয় সার্কস। আজকাল কলিকাতায় বঙ্গসমাজে একটী নূতন ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ব্যাপারটি আর কিছুই নহে। কয়েক জন উৎসাহশীল বাঙ্গালিকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সার্কস্। সার্কসের তামাসা করিতে হইলে, যেরূপ নানাপ্রকার দৈহিক ব্যায়াম, এবং অশ্বারোহণের কৌশল দেখাইতে হয়, তাহাতে এক বৎসর পূর্ব্বেও আমরা আশা করিতে পারি নাই, যে নির্জ্জীব বাঙ্গালীরা একার্য্য কখন করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু বাস্তবিক এ বৎসরের কাণ্ড কারখানা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি; এবং আমাদের মনের অনেক লুপ্ত-আশা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়াছে। বিশেষ আবার যখন বাঙ্গালীর মেয়েকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করিয়া অবলীলাক্রমে নানাবিধ কৌশল দর্শাইতে

দেখিলাম, তখন আনন্দে এবং উৎসাহে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। লজ্জাশীলা, অবলা, অবগুণ্ঠনবতী, অন্তঃপুরবাসিনী বাঙ্গালীর কন্যা যে অশ্বারূঢ়া হইয়া ক্রীড়া কৌশলে সহস্র সহস্র দর্শককে চমৎকৃত করিবে, ইহা আর কে কবে ভাবিয়াছিল?

প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র এই অভিনব সার্কসের অনুষ্ঠাতা। নবগোপাল বাবু নীরবে নির্ব্বিবাদে, অলক্ষিতভাবে দেশের উপকারের জন্য অনেক কার্য্য করিয়াছেন। হিন্দুমেলা তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত; তাঁহার নিঃস্বার্থ এবং অবিশ্রান্ত চেষ্টায় এই শেষ ফল দেখিয়া যে আমরা কতদূর সুখী এবং সন্তুষ্ট হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে অক্ষম।

সার্কস হইতে অবশ্য এখনই আমাদের কোন প্রকার বিশেষ উপকার হইবে না; কিন্তু গৌণভাবে ইহা হইতে আমরা অনেক উপকার প্রাপ্ত হইব। বাঙ্গালিজাতি স্ত্রীপুরুষে একেবারে যে "সবলা, অবলা, কুলবালা," তাহা কি ভারতবর্ষের অপর প্রদেশের লোক, কি পৃথিবীর অন্যান্য দেশীয় লোক,—সকলেরই মনে এরূপ একটী ভাব উপস্থিত আছে। সকলেই বলে যে, বাঙ্গালীরা বুদ্ধিমান বটে, উপর উপর তাহাদের অনেকটা চালাকি আছে, মানসিক বিষয়েও তাহারা অনেকটা সক্ষম,—কিন্তু তাহারা 'ভেতো।" বিদ্যা যতই দেখাক না কেন, বক্তৃতা যতই করুক না কেন, সম্বাদপত্র যতই লিখুক না কেন, আসলে কিছু নাই; একটি "তাড়া" খাইলেই তাহারা পিতা পিতামহের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যায়! এই কারণে আমরা অন্যান্য দেশের কথা দূরে থাকুক, এমন কি ভারতবর্ষের অপরাপর দেশের লোকদিগের নিকটও কখন অনেক বিষয়ে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারি না। কিন্তু আমরা বিবেচনা করি যে, যদি বাঙ্গালীরা এইরূপ সার্কস কিম্বা তদনুরূপ অন্যান্য প্রকার ব্যায়ামসাপেক্ষ ক্রীড়াকৌশলেও আপনাদিগের কৃতকার্য্যতা দেখাইতে পারে, তাহা হইলে ক্রমশঃ তাহাদিগের 'ভেতো' দুর্নামটি দূরীভূত হইয়া যাইবে।

ইলবার্ট বিল।—ইলবার্ট বিল কেবল মাত্র "সূত্রটি" রাখিয়া কিছু দিনের জন্য আমাদিগের নয়নপথ হইতে অপসৃত হইয়া গিয়াছিল, ইংলণ্ডের লোকেরা আবার তাহাকে কেশাকর্ষণ করিয়া বঙ্গভূমিতে লইয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টের উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। আমাদের ভয় হইতেছে যে আমাদের দুঃখ, অবমাননা, এবং নৈরাশ্যের কঠোরতা পরিবর্দ্ধন করিবার জন্যই বুঝি ইলবার্ট বিল "যাবো যাবো" সময়ে আবার দেখা দিতেছে। লর্ড রিপন এবং তাঁহার সদস্যগণ "আত্মবঞ্চিণী" সভার সঙ্গে যে বন্দোবস্তে ইহার উপসংহার করিয়াছেন, শুনিতেছি ইংলণ্ডের ক্ষমতাশালী অনেক লোক তাহাতে সন্তুষ্ট হয়েন নাই। কেহ কেহ এমন বলিতেছেন যে, হয় ত, ষ্টেটসেক্রেটরি এই বন্দোবস্ত নামঞ্জুর করিবেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের নিজের অদৃষ্টের উপর আমাদের বিশ্বাস নাই; তবে দয়াময় পিতৃতুল্য ইংরাজরাজত্বে নাকি আমাদের কোন প্রকার "আমাদেরত্ব" নাই; যাহা খাই, যাহা পরি, যাহা বলি, যাহা শুনি, যাহা ভাবি, সে সমস্তই গবর্ণমেণ্টের উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিয়া থাকি, সেই জন্য এই কথাটি

শুনিয়া আবার উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছি। লালমোহন ঘোষ এখনও বিলাতে আছেন, মহাত্মা জন ব্রাইট এখনও জীবিত আছেন; যদি তাঁহারা কিছু করিয়া উঠিতে পারেন ত দেখুন। আমরা যতদূর করিয়াছি, তাহা করিয়াছি, আর পারিব না। আমাদের যে কার্য্য তাহা আমরা করিতে থাকি,—দলাদলি, বেষারেষি, ঠোকাঠুকি।—আত্মবিচ্ছেদ—গৃহবিচ্ছেদ—বন্ধুবিচ্ছেদ—আমাদের বড় ভাল লাগে, আমরা দল বাঁধিব না, আমরা একমত হইব না। তবে, পরে যদি কিছু আমাদের করিতে পারে ত করুক।

মিসর সমর।—সহসা কয়েকটী দুর্ঘটনায় ইংলণ্ডের লোক একপ উদীপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন, যে তাহা পণ্ডিত না করিয়া ইলবার্ট বিল লইয়া যে তাঁহারা চিন্তা করিতে পারিবেন এমন আশা হয় না। সম্প্রতি, ইংরাজেরা মিসরের সৌদান প্রদেশস্থ মাহাদির অসভ্যসৈন্যকর্ত্তৃক উপর্য্যুপরি দুই তিনটি যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছেন। মিসরের সঙ্গে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান কি সম্বন্ধ, তাহা বোধ করি আমাদের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। ইংলণ্ড এক্ষণে সসৈন্যে এবং সদলবলে মিসরে অবস্থিতি করিতেছেন; তথায় শান্তি এবং সুশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করিয়া তাঁহারা প্রত্যাগত হইবেন না। এই উদ্দেশ্যে গত বৎসর হইতে নানা প্রকার বন্দোবস্ত হইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ মিসরসংলগ্ন সৌদান প্রদেশে মাহাদি নামক একব্যক্তি প্রভূত সৈন্যসামন্ত লইয়া মিসর আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইংরাজেরা বিদেশীয় এবং বিজাতীয় হইয়া যে মিসরস্থ মুসলমান রাজত্বে আপনাদের আধিপত্যবিস্তার করিবেন, ইহা সৌদানের অধিবাসিদিগের অভিপ্রেত নহে। সেই জন্য মাহাদি সসৈন্যে উত্থিত হইয়াছেন। ধর্ম্মশিক্ষিততা তাহাদিগের উত্তেজনার একটি প্রধান কারণ; সেই জন্য তাহারা অসভ্য এবং অশিক্ষিত হইয়াও বিশেষ দক্ষতা ও কৌশলের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। ইংরাজদিগের পক্ষ হইতে দুই একজন লব্ধনামা সেনাপতি সসৈন্যে তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু উপর্য্যুপরি দুই তিনটি যুদ্ধে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ পরাভূত হইয়াছেন। এই কারণে ইংলণ্ডে ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। অপমানবিদ্ধ কিম্বা ক্ষুব্ধচিত্ত হইলে ইংরাজেরা যেরূপ দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, হয়ত তাঁহারা অবিলম্বেই একটী প্রকাণ্ড যুদ্ধব্যাপারে নিমগ্ন হইয়া পড়িবেন। হুইগ এবং টোরিদলে মহা বাগ্‌বিতণ্ডা উঠিয়াছে, হুইগেরা অদ্যকাল শাসনভার প্রাপ্ত; টোরিরা সদলবলে একত্রিত হইয়া মহাসভায় তাঁহাদিগের উপর শাসন-অক্ষমতার অভিযোগ আনয়ন করিতেছেন। অনেকে বলিতেছেন যে, এই জন্য মন্ত্রিসমিতির পরিবর্ত্তন হওয়াও আশ্চর্য্য নহে।

কিন্তু আমরা ভারতবাসী, আমরা আর কি করিব? বসিয়া বসিয়া ব্যাপারটা দেখিতে থাকি। তবে ভয় এই যে, যদি যুদ্ধ রীতিমত প্রস্তাবে বাঁধে, তাহা হইলে, ভারতবর্ষ হইতেও সৈন্য প্রেরিত হইবে, এবং আমাদিগকেই তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। আর এক ভয়—যদি মন্ত্রীসভার পরিবর্ত্তন হয়, হুইগেরা যাইয়া টোরিরা শাসনভার প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে, ভারতবর্ষীয় রাজনীতি সম্বন্ধেও বহুবিধ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে।

লর্ড-রিপন হুইগদলের প্রেরিত, তিনি ত তখনই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে, আমাদিগের অনেক আশা নির্ম্মূলিত হইবে, অনেক আকাঙ্ক্ষায় ভস্ম পড়িবে। লর্ড-রিপন ভারতবর্ষের উপকারের জন্য কয়েকটী মহৎ বিধানের সূচনা করিয়াছেন; স্বায়ত্ত-শাসন তন্মধ্যে একটী প্রধান, কিন্তু, এখনও তাহার অঙ্কুর-অবস্থা। এখন যদি হটাৎ লর্ড-রিপন চলিয়া যান তাহা হইলে আমাদের ভয় যে, এই স্বায়ত্ত-শাসন বিধি অঙ্কুরেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে। আমাদের পোড়া-অদৃষ্টে আর কখনই সুখ নাই।

লর্ডরিপন এবং তাঁহার মান্দ্রাজ পরিদর্শন।—ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভাবধি অনেক গবর্ণর আসিলেন গেলেন; কিন্তু, বোধ করি লর্ডরিপণের মত কেহই প্রশংসালাভ করিতে পারেন নাই। এক ইলবার্টবিলের প্রস্তাব করিবামাত্র তাঁহার প্রশংসাধ্বনিতে সমস্ত ভারতবর্ষ একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ইলবার্টবিল লোকের অকাঙ্ক্ষানুরূপ বিধিবদ্ধ হইল না; বরঞ্চ সকলের মনে ব্যথা দিয়া এক অপূর্ব্ব, অসঙ্গত আকারে আইনে পরিণত হইল। কিন্তু তথাপি লর্ডরিপনের উপর লোকসাধারণের যে অটল ভক্তি তাহা টলিল না। সেই ইলবার্টবিলের পূর্ণাহুতি দিয়াই লর্ডরিপণ সেদিন মান্দ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন; মান্দ্রাজ হইয়া হাইদ্রাবাদে নিজামকে সিংহাসনারূঢ় করিতে গিয়াছিলেন। মান্দ্রাজের লোকেরা, ভদ্রে ইতরে, ধনি দরিদ্রে, শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, তাঁহাকে যেরূপ সম্মান এবং আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীস্থ অনেক শিক্ষিত যুবকেরা স্বস্কন্ধে তাঁহার শকট বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয়দিগের এই অসাধারণ ভক্তি সন্দর্শন করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইংরাজেরা বিস্মিত হইতেছেন তাহা কিছু বিচিত্র নহে, আমরাই অবাক হইয়া গিয়াছি।

কিন্তু এই প্রগাঢ় ও অসাধারণ ভক্তির কারণ কি? কারণ, আমরা বলি, আর কিছু নহে, সাধারণ ইংরাজদিগের ঘৃণা, অযত্ন, এবং তুচ্ছতাচ্ছিল্যে আমাদের অবস্থা ক্রমশঃ এত শোকসন্তপ্ত হইয়াছে এবং আমরা এতদূর মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছি, যে এমন অবস্থায় যে কোন ব্যক্তি হউক দুইটী ভাল কথা বলিলেই আমাদের হৃদয়-উৎস উন্মুক্ত হইয়া যায়, মুহূর্ত্তমধ্যে আমরা কৃতজ্ঞতারসে প্লাবিত হইয়া যাই। একজন সামান্য লোক হইলেই আমরা কত দূর কৃতজ্ঞ হই, তাহাতে আবার যদি সৌভাগ্যক্রমে রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং এরূপ হয়েন, তাহা হইলে আর আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমাপরিসীমা থাকেনা। আমরা তাঁহার সকল প্রকার দোষ ভুলিয়া যাই; যাইয়া দেবতাজ্ঞানে তাঁহাকে হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত করিয়া লই।

এই আশ্চর্য্য কৃতজ্ঞতা যে ভারতবর্ষীয় লোকদিগের মহোন্নত হৃদয়ের একটী প্রধান লক্ষণ, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, যেন সময়ে সময়ে ইহা অত্যন্ত বেশী—অর্থাৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের হৃদয়ের মহত্ত্ব দ্বিগুনতর প্রভাবে প্রকাশিত হয় বটে

কিন্তু আমাদের স্বার্থের হানি হয়, তখন আমরা নিজে নিজের স্বার্থ ভুলিয়া যাই। আমরা একবার যে গলিয়া যাই, সেই গলিয়াই থাকি; আমাদের উপর যে অবিচার কিম্বা অন্যায় হইয়া থাকে তজ্জন্য মনের মধ্যে একটা নিরন্তর ক্ষোভ উপস্থিত থাকে না। কিন্তু এরূপ ক্ষোভই সকল প্রকার রাজনৈতিক উন্নতির মূলীভূত কারণ। যে জাতির মধ্যে এই ক্ষোভের প্রাবল্য কম, সে জাতি সহস্র বৎসর পদদলিত হইলেও কখন মস্তকোত্তোলন করিতে সমর্থ হয় না। এই ক্ষোভের দ্বারা উদ্দীপ্ত হইলে যে একেবারে রাজবিদ্রোহী হইতে হয় তাহা নহে, রাজাকে রাজোচিত সম্মান করিব, সদ্ভাবরক্ষা দীনভাবে তাঁহার অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিব, কিন্তু তথাপি, তাঁহার কৃত অন্যায় কিম্বা অবিচারের জন্য (যদি কিছু থাকে) কখন সন্তুষ্ট চিত্তে নীরব হইয়া থাকিব না। সর্ব্বদা তাঁহাকে বিরক্ত করিব; সর্ব্বদা আপনাদিগের মধ্যে দল বাঁধিব; সর্ব্বদা সদল বলে রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের অভাব জ্ঞাপন করিব। যে দেশের লোক আপনাদিগের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি করিতে চাহে, তাহাদের ঠিক এইরূপ ভাবে চলা উচিত আমরা ভারতবর্ষের লোক— আমরা কি কখন এই ভাবে চলি? কখনই নহে। আমাদের মনে এরূপ প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন উত্তেজক অসন্তুষ্টি একেবারেই নাই। আমরা এরূপ রাজভক্ত যে, আমরা সেই রাজভক্তিতে একেবারে দ্রবীভূত হইয়া থাকি; ভক্তি প্রকাশ করিবার জন্য আমরা সহস্র সহস্র লোক একত্রিত হই; সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করি; জয়ধ্বনি, হুলুধ্বনি, আলো, আতসবাজি দ্বারা দেশ পরিপূর্ণ করিয়া তুলি। কিন্তু যে লোকেরা এই ছজুক পূর্ণ ব্যাপারে প্রাণপণ যত্নে এবং অকাতরে পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় করিবে, দেশের উন্নতির উদ্দেশে কোন কার্য্য করিব বলিয়া তাহাদিগকে আহ্বান কর, দেখিবে, তাহাদের একটীকেও পাইবে না। অমনি সকলে উদাসীন; অমনি সকলে লুক্কায়িত; আর কোথাও কোন উচ্চবাচ্য নাই। কিন্তু এরূপ ভাবে চলিলে কখন কি ভারতবর্ষের উদ্ধার সাধন হইবে? আমরা বলি কখনই নহে।

সইঅদ আমেদ খাঁ।—পাঠক মাত্রেই বোধ করি অবগত আছেন যে সইঅদ আমেদ খাঁ কে। ইনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশ বাসী এক জন পরম দেশহিতৈষী মুসলমান। ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন করিবার অভিপ্রায়ে ইনি অনেক কার্য্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত এবং উদার ভাবাপন্ন মুসলমানদিগের ইনিই প্রধান নেতা। গবর্ণমেণ্টেও ইঁহার মান্য যথেষ্ট; ইনি সি, এস, আই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সভ্য। হিন্দু মুসলমানে যাহাতে একতা সংস্থাপিত হয়; দুই সম্প্রদায় একমত এবং এক স্বার্থাপন্ন হইয়া মাতৃভূমির উন্নতি সাধন করিবার জন্য যাহাতে কার্য্য করে, ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সম্প্রতি তিনি লাহোরে গিয়া তথাকার ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনকে সম্বোধন করিয়া একবক্তৃতা করিয়াছেন। সেই বক্তৃতা মধ্যে তিনি সহস্র মুখে সমগ্র বাঙ্গালীজাতিকে বড় প্রশংসা করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালীরাই আজকাল ভারতবর্ষের একমাত্র ভরসা স্থল; বাঙ্গালীরা দেশের উন্নতিসাধন করিন-

বার জন্য যেরূপ চেষ্টা করে, তাঁহার মতে, ভারতবর্ষের অপরাপর অধিবাসীরা কেহই তেমন করেনা। সুরেন্দ্র বাবুর উপর তাঁহার অচলাভক্তি, ইণ্ডিয়ান. আসোসিয়েসনের উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। বোধ করি, পাঠকগণের স্মরণ আছে, হাইকোর্টের আজ্ঞা-ক্রমে সুরেন্দ্র বাবুর যখন কারাবাস হয়, তখন, এই সইদ আমেদ খাঁই আলীগড়ে এক মহতী মুসলমানসভা আহ্বান করিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য উচ্চপদস্থ ইংরাজ মণ্ডলীতে তাঁহার বিশেষ অখ্যাতি হইয়াছিল, অনেক রাজপুরুষেরা তাঁহার উপর ঘোর অসন্তুষ্টি পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মা সইদ এসমস্তে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। তিনি নিজের পদোন্নতি কিম্বা সম্মান বৃদ্ধির ভয়ে আপন কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে কখন বিমুখ হয়েন না। তিনি অসাধারণ সাহসী লোক, নিজ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ নহেন। এরূপ লোক যে আমাদের—কি হিন্দু কি মুসলমান—সকলেরই শ্রদ্ধাস্পদ এবং ভক্তি ভাজন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ লোককে দলে লওয়া উচিত, এবং তাঁহাকে দলপতি করিয়া কার্য্য করা উচিত। হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক বৈরীভাব ভারতবর্ষের উন্নতির পক্ষে একটী প্রধান অন্তরায়। দেশের উন্নতি করিব বলিয়া যিনিই কেন কৃতসঙ্কল্প হউন না. তজ্জন্য তাঁহাকে যে যে কার্য্য করিতে হইবে, তন্মধ্যে এই উভয় সম্প্রদায় মধ্যে মিলন এবং এক-প্রাণতা আবির্ভূত করা একটী প্রধান। যত দিন না আমরা আপন গৃহে শান্তিস্থাপন করিতে পারিব, ততদিন আমাদের কোন চেষ্টাই সফল হইবেনা। হঃ মঃ

নানাকথা।

গত জানুয়ারি মাসে বঙ্গীয় আসিয়াটিক সোসাইটীর, শত বার্ষিকী উৎসব বিলক্ষণ জাঁক জমকের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই 'সোসাইটী' ১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ে মহাত্মা সার উইলিয়ম জোন্সের যত্নে সংস্থাপিত হইয়া এক শতাব্দী কাল পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় নানা বিষয়িনী গবেষণায় নিযুক্ত আছে এবং প্রাচ্যজাতীয়দিগের শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক বহুবিধ বিলুপ্তপ্রায় তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া সংরক্ষণ করিতেছে। বলা বাহুল্য যে, আসিয়াটীক সোসাইটীর যত্নেই প্রাচীন আর্য্যদিগের কীর্ত্তি কলাপের ভগ্নাবশেষ ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতে পাইতেছেনা। ফলতঃ আর্য্যসন্তান-মাত্রেই এই সোসাইটীর নিকট ঋণী, এবং যে মহাপুরুষের যত্নে প্রথমতঃ ইহার ভিত্তি স্থাপিত হয় তিনি সকলেরই আন্তরিক ধন্য-বাদের পাত্র। পৃথিবীর অন্যান্য যত স্থানে এই প্রকৃতির 'সোসাইটী' আছে, তাহাদিগের সকলেরই অপেক্ষা বঙ্গের 'আসিয়াটীক সোসাইটী' প্রাচীন। মহামনা সার্ উইলিয়ম জোন্স, ভারতে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই, ইহার প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গৌর-বের বিষয় উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়া-

ছিলেন এবং কলিকাতায় পৌঁছিবার কয়েক মাস পরেই এই সোসাইটীর সংগঠন ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম মিঃ গ্রিফাবিসনের তত্ত্বাবধানে বাঁকিপুরে 'সোসাইটীর' একটী শাখা সংস্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে।

ঐতিহাসিক ঘটনার ন্যায় ঔপন্যাসিক ঘটনারও পৌনঃপুনিক আবির্ভাব হয়। উদাহরণ স্বরূপ ঈনফেব' অশ্ব বিক্রেতার উপন্যাস ও ভারতীয় 'ইলবার্ট বিল'। অশ্ব বিক্রেতার ন্যায় লর্ড রিপন সকলকেই সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু নিজের 'ঐকান্তিক ক্ষীণতা' বশতঃ কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই; প্রত্যুতঃ সকলেরই বিদ্রূপভাজন হইয়াছেন। পক্ষান্তরে উপন্যাসের অশ্বের ন্যায় 'বিল' খানি অবশেষে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

একটী নূতন সংবাদ। (রহস্য নয়)—বিলাতে ভূতের 'সেন্সস্' অর্থাৎ 'মরদুম সুমারী' লওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছে। 'আপিসের ঠিকানা "১৪ নং ভিনস্ ইয়ার্ড ওয়েষ্ট মিনিষ্টার"। ভূতদিগের সংখ্যা গণনার পর বোধ হয় তাহাদের পিতৃশ্রাদ্ধ করার উদ্যোগ হইবে? মহদভিপ্রায় বটে!

"একখানি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, কুশাতে ইলেকট্রিসিটী কার্য্য করিতে পারে না: এই জন্য পুরাকালে ভারতের যোগী-ঋষিরা কুশাসন ব্যবহার করিতেন এবং অনেক প্রকার ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতেন।"—সহচর।

ক্রমে ক্রমে দেখা যাইতেছে প্রাচীন হিন্দুদিগের কোন কার্য্যটীই বৃথা বা নিন্দনীয় নহে। তাঁহাদের যে সকল কার্য্য বা অনুষ্ঠানকে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজানুকারী সভ্য বলিয়া গর্ব্বভরে ঘৃণা করি, সে সকল কার্য্যের মধ্যেই যে কত শতসহস্র বিজ্ঞান লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা যত বুঝিতে পারিতেছি ততই বিস্মিত হইতেছি। যে ইয়ুরোপীয়েরা দর্শনবিজ্ঞানে বর্ত্তমান জগতে এত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন—তাঁহারাই প্রাচীন আর্য্যদিগের পদার্থ-বিজ্ঞানের এক কণামাত্র পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। আর্য্যদিগের প্রত্যেক কার্য্যের সহিত বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, নীতি, ধর্ম্ম, সুখ, স্বচ্ছন্দতা প্রভৃতি এত গূঢ়ভাবে সংমিশ্রিত যে, ভাবিতে গেলে বিস্ময় ও আনন্দরসে চিত্ত উচ্ছলিত হইয়া উঠে। আমরা কুলাঙ্গার তাই সে সকলের মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া ঘৃণার সহিত পরিবর্জ্জন করি, আর চিরকাল রোগে শোকে দুঃখে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ক্রমশঃ অল্পবয়সেই ম্রিয়মান হইয়া পড়ি।

বিগত ৮ই ফাল্গুন যশোহরের অন্তর্গত নলডাঙ্গায় তথাকার উন্নতিশীল অধিপতি রাজা প্রমথনাথ দেব রায়ের প্রযত্নে ও উৎসাহে একটী সুখদ বিধবাবিবাহ সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। বিবাহটী সর্ব্ববিধায়ে সুখের। প্রথমতঃ এটী হিন্দুমতে সম্পাদিত বিধবা বিবাহ, দ্বিতীয়তঃ পাত্র বাবু কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায় নলডাঙ্গার রাজ কর্ম্মচারী—একজন পঞ্চ বিংশতিবর্ষবয়স্ক শিক্ষিত যুবা পুরুষ, এবং পাত্রী শ্রীমতি রাজকুমারী দেবী আর্য্যদর্শন সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণের অষ্টাদশবর্ষীয়া জ্যেষ্ঠতাতপুত্রী; তৃতীয়তঃ স্বয়ং নলডাঙ্গার অধিপতি বিবাহের

ঘটক; চতুর্থতঃ কার্য্যস্থলে অনেক গুলি শিক্ষিত ও উন্নতিশীল ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল। অনেক হিন্দু ব্রাহ্মণেও অন্তরের সহিত এ বিবাহে অনুমোদন ও শেষে ভোজন করিয়া আসিয়াছেন। বাস্তবিক রাজাদিগের এই প্রকার কার্য্য দেখিলে অন্তর এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় পুলকে ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। জানি না কতদিনে আমাদের দেশের সকল রাজাগণ এই প্রকার সমাজের মঙ্গলসাধন ও দেশের উন্নতি বিধানে বদ্ধপরিকর হইবেন!

ভারতদ্বেষী সাহেবেরা 'ইলবার্ট' বিল উপলক্ষে নাটকাভিনয়ও করিয়াছিলেন। "ইল বার্টী লিবার্টী" নামক একখানি নাটক লিখিত হইয়া সিমলা-শৈলে কয়েকবার অভিনীত হইয়াছিল। নাটক খানির উদ্দেশ্য অবশ্য লর্ডরিপন ও ইলবার্ট সাহেবকে বিদ্রূপ করা। উদ্দেশ্য যাহাই হউক, নাটক খানির রচনা নিতান্ত অপকৃষ্ট। 'রাইচ্ এণ্ড রায়তের সম্পাদক, ইংরাজিসাহিত্যের একজন সুবিচারক। ইনি এই পুস্তকসমালোচনপ্রসঙ্গে বলেন যে ইহার অধিকাংশ স্থলের ভাষা বিশুদ্ধ ইংরেজী হইতে বহুদূরে স্থিত। বিলবিদ্বেষী ফিরিঙ্গিগণ প্রায় বৎসরাবধি বুদ্ধিবিবেচনাবিহীন হইয়াছিলেন ইহা অবশ্য আমরা জানি, কিন্তু ইঁহারা মাতৃভাষা বিবর্জ্জিত হইয়াছিলেন ইহা আমরা জানিতাম না। মনুষ্য উন্মত্ত হইলে তাহার কোন জ্ঞানই থাকেনা, অতএব ইংরেজেরা ইংরেজী-ভুলিয়া যাইতেছিলেন ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

ফিরিঙ্গি-সাহিত্য-ক্ষেত্রে আর একখানি অদ্ভুত গ্রন্থ উদিত হইয়াছে। এখানির নাম India in 1983 অর্থাৎ ১৯৮৩ সালের ভারতবর্ষ। পুস্তক খানির লেখক কে, ঠিক জানি না। বোধ হয় ইংলিশমানের ব্রিটানিকাস কিম্বা তাঁহারই গোষ্ঠীর আর কেহ হইবেন, নতুবা প্রতিভার এমত তেজ আর কার? বিগত মাসকয়েক মধ্যেই এই পুস্তক খানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে বিল ও বাঙ্গালিবিদ্বেষী সাহেবেরা আগ্রহের সহিত ইহা পাঠ করিতেছেন। নিচমনা ফিরিঙ্গীরা শিক্ষিত বাঙ্গালীর হিংসা ও কুৎসা চিরদিনই করিয়া থাকেন, এ সময়ে আরও অধিক করিবেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া আমরা যথার্থই আশ্চর্য্য হইতেছি। স্বয়ং 'সিসিরোর' প্রতিকৃতি মিঃ 'আটকিন' বিলাতে যাইয়া যেরূপ বাগ্মিতা-বহ্নি উদ্গীরণ করিতেছিলেন তদ্দ্বারা টেমস্‌নদীর জল পুড়িয়া 'ছারখার' হয় নাই ইহাই বিস্ময়কর। পরন্তু 'ইলবার্টী লিবর্টী' নামক মহানাটকে দ্বিতীয় শেক্সপিয়ার বজ্রমাংসে অবতীর্ণ। তারপর ভারতের ভবিষ্য ইতিহাস লেখক; ইনি বস্তুতই উপমারহিত। খোদ 'গিবনও' ইহার একটী অঙ্গুলির যোগ্য নহেন। যাহা হউক এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল মহামনস্বী পণ্ডিতপুঙ্গবগণ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় কোন্ চুনাগলিতে লুকাইয়া ছিলেন! বিগতপ্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর গৌরব রক্ষার্থেই কি 'ইলবার্ট বিল'রূপ ফুৎকারে ইঁহাদের প্রতিভাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে? মরি মরি, কি রচনাশক্তি! কি রসোদ্ভাবন ক্ষমতা! অকৃতজ্ঞ (?) সাহিত্য জগৎ

ইঁহাদিগকে কি পুরস্কার দিল? 'অমরত্বেও' যে ইঁহাদের ঠকা হয়। ইঁহারাই অবশ্য বাঙ্গালীর 'ইংরেজী লেখাকে' "বাবুইংরাজী" বলিয়া বিদ্রূপ করেন? আহা তা করিবেন না! করিবার অধিকার আছে বলিয়াই করেন!

"নাইণ্টিন্থ-সেঞ্চুরী" নামক বিলাতের সুবিখ্যাত মাসিক পত্রের সত্বাধিকার জনৈক 'উন্নতিশীল বাঙ্গ-নৈতিক' ক্রয় করিয়াছেন। এই পত্র জেমস্ নয়েল কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। ইহাতে গ্লাড্‌ষ্টোন, টেনিসণ, আরনল্ড, বেনান, প্রভৃতি বড় বড় লোকে নিয়মিতরূপে প্রবন্ধ লিখিতেন। এই পত্রের গ্রাহক সংখ্যাও অবশ্য বিস্তর ছিল এবং তদ্দ্বারা আয়ও বিলক্ষণ হইত। কিন্তু তবে ইহার স্বত্বাধিকার বিক্রয় হইয়া যাওয়ার কারণ কি? ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, এই পত্রের বিস্তর আয় ছিল বটে কিন্তু ব্যয় তদপেক্ষা অধিক হইত। অধিক ব্যয়ের কারণ এই যে ইহাতে যে সকল বড় বড় লোক প্রবন্ধ লিখিতেন তাঁহাদিগের সকলকেই টাকা দিতে হইত। এক একটী প্রবন্ধের মূল্য স্বরূপ এত অধিক পরিমাণে টাকা দিতে হইত যে কাগজখানির প্রচুর আয় সত্বেও ব্যয় সঙ্কুলান হওয়া ক্রমে কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং স্বত্বাধিকারী অগত্যা কাগজখানি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে 'নাইণ্টিন্থ সেনচুরীর' সম্পাদক একটী গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রবন্ধলেখকদিগের নামের উপর যেরূপ লক্ষ রাখিতেন প্রবন্ধের সারবত্তা ও মনোজ্ঞতার প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি রাখিতেন না। এই কারণে ক্রমে কাগজখানির পসার কমিতে আরম্ভ হওয়ায় স্বত্বাধিকার বিক্রীত হইয়াছে। যাহা হউক উক্ত পত্রের ন্যায় একখানি উচ্চ শ্রেণীর কাগজ সম্প্রদায় বিশেষের 'যন্ত্রে' পরিণত হইলে সাহিত্যানুরাগীর পক্ষে বিশেষ দুঃখের বিষয় বটে।

বিগত অক্টোবর মাস হইতে 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ' নামক একখানি ইংরেজী মাসিক পত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। পত্র খানির কলেবর বিলক্ষণ বৃহৎ, দুই শত পৃষ্ঠার অধিক। ইহাতে সাধারণতঃ প্রধান প্রধান বিলাতি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের সার সংগ্রহ থাকে ও তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষ সংক্রান্ত নবপ্রকাশিত পুস্তকাদির সমালোচনাও প্রকাশিত হয়। পত্র খানির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অবশ্য এখনও কিছু ঠিক অনুমান করা যায় না। তবে ইহাতে যেরূপ বিজ্ঞানের প্রাচুর্য্য দেখা যাইতেছে, ইহার গ্রাহক সংখ্যাও যদি তদনুরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেবল পত্র খানির স্থায়িত্বের কেন, স্বত্বাধিকারীরও বিলক্ষণ আয়ের সম্ভাবনা। বস্তুতঃ রিভিউয়ের, প্রথম সংখ্যাতেই এত বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হইয়াছিল, যে তাহাতে আমরা কতকটা বিস্মিত হইয়াছিলাম। সাহেবেরাই যথার্থ ব্যবসা বুঝেন ও স্বদেশীয় ব্যবসায়ীকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিতে জানেন।

পাক্ষিক সমালোচক।

প্রথম খণ্ড।] সন ১২৯০ সাল, চৈত্র, প্রথম পক্ষ। [তৃতীয় সংখ্যা।

পুরাণ ;—সমালোচন।

প্রথম প্রস্তাব।

সকল দেশেরই ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মানবহৃদয় আদিমকাল হইতে বিবিধ ভয় হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই রক্ষণ-ইচ্ছা বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সমবলে জীবের হৃদয় অধিকার করিয়া আছে। প্রথম ভয়—দেহনাশ ; দ্বিতীয় ভয়—আত্মনাশ। ষড়ঋতুর কশাঘাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য শ্রেষ্ঠজীবমাত্রেই চেষ্টিত। সৃষ্টির প্রারম্ভে মনুষ্য স্বভাবের পুত্র ছিলেন। নৈশগগন তাঁহার চন্দ্রাতপ, চন্দ্রসূর্য্য দীপমালা, নদীর জল পানীয়, বনের ফলমূল ও আমমাংস ভক্ষ্যদ্রব্য, বৃক্ষতল গৃহ, বৃক্ষচ্যুত পত্র শয্যা এবং বল্কল পরিধেয় ছিল। এই সমস্তই কেবল শরীর রক্ষার্থে আহরিত ও ব্যবহৃত হইত। পক্ষান্তরে আত্মা অর্থাৎ দেহ-হস্ত-পদাদি-ভিন্ন অন্তরে যে একটী পৃথক্ বস্তু আছে তাহার রক্ষার্থে যে উপায় অবলম্বিত হইত, তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ। যাহা মহান্, যাহা বৃহৎ, যাহা উচ্চ, যাহা অনন্ত, তৎসমুদায়ই ভীতিসঞ্চারের নিদান বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। সুতরাং প্রীতিসম্পাদন মানসে ও প্রসাদলাভের বাসনায় সেই সমুদায়কে পূজা করা হইত। ইহাই প্রকৃতিপূজা। তৎপরে যখন এক এক জন মনুষ্য সাধারণ-সীমা অতিক্রম করিয়া কিঞ্চিদধিক স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেন এবং যাঁহার বল বুদ্ধি বিক্রম বা বিদ্যা সাধারণ পথ ত্যাগ করিত, অর্থাৎ অসাধারণ বলিয়া সাধারণ্যে প্রতীত হইত, তিনিই দেবতার ন্যায় পূজিত হইতেন। প্রথমে প্রায় সকল দেশেই এই রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং অসভ্যদিগের মধ্যে অদ্যাপি হইতেছে। ইহাকেই নরপূজা বলে। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে ইহার ছায়া লক্ষিত হইয়া থাকে।

নরপূজা আর্য্য-আবাস ভূমি মধ্য-আসিয়াতে প্রচলিত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদিগের বিবেচনায় সর্ব্বাগ্রে আর্য্যেরাই জগতের আদিম পিতা মাতা ছিলেন। যে ককেশীয় (Caucasian) জাতি দৈহিক সৌন্দর্য্যের জন্য জগদ্বিখ্যাত, এক্ষণকার সভ্য ইয়ুরোপীয়েরা আপনাদিগকে যে গৌরবর্ণ-ককেশীয়-জাতি-সম্ভূত বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন, যে বর্ণ-গরিমা আজ ভারতে এত অস্বাভাবিক পার্থক্য ও বৈষম্য সৃষ্টি করিয়াছে,—ইতিহাসের কথা বিশ্বাস করিলে নিঃশঙ্কচিত্তে এ কথা বলা যাইতে পারে যে,—আর্য্যেরাই সেই ককেশীয় জাতি।

আর্য্যেরা স্থানাভাববশতঃ বা অন্য কোন কারণে পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া দিগ্-দিগন্তরে বিক্ষিপ্ত হন। কেহ পূর্ব্বে এবং কেহ বা পশ্চিমাভিমুখে গমন করেন।

কালের বিচিত্রগতিতে সেই পশ্চিমগামি আর্য্যসন্তানেগণ পূর্ব্ব-দেশবাসি-আর্য্যসন্তানদিগকে ভ্রাতৃ সম্বোধন না করিয়া বর্ণ-বিভিন্নতা দোষের (?) জন্য বিষনয়নে দেখেন ও অযথা ঘৃণা করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, ভারতে আসিবার পূর্ব্বেই আর্য্যদিগের মধ্যে নরপূজা এবং প্রকৃতিপূজার সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন মিত্র, বরুণ ও ইন্দ্র এই তিন জন দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন। পারস্য দেশবাসিদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ অনুসন্ধান করিলেও বরুণ ও ইন্দ্র এই দুই দেবতার নাম পাওয়া যায়।

আর্য্যেরা ভারতে আসিয়া প্রথমে পঞ্চাপ (পঞ্জাব) প্রদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। আজ ইংরাজেরা আমাদিগকে যেমন কৃষ্ণকায় বলিতেছেন, পূর্ব্বতন আর্য্যেরাও সেইরূপ আপনাদিগকে দেবতা বা সুর এবং ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসিদিগকে বর্ব্বর বা অসুর বলিতেন। দেবাসুরের যুদ্ধ—অথবা অসভ্যতা, মূর্খতা এবং বর্ব্বরতার উপর জ্ঞান ও সভ্যতার জয়লাভ—অনেকের মতে বর্ত্তমান দুর্গোৎসবে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু তদ্বিষয়ের আলোচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।।

বিষ্ণুপুরাণে সৃষ্টি প্রকরণ সম্বন্ধে এরূপ লিখিত আছে যে, ভগবান প্রথমে দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তাঁহারা পরব্রহ্মের চিন্তন ভজন ও পূজনে সর্ব্বদা এত নিবিষ্ট থাকিতেন যে তাহাদিগের দ্বারা সৃষ্টির বিশেষ উপকার দর্শিল না, তাঁহারা সংসারধর্ম্মবিষয়ে একবারে উদাসীন হইয়া পড়িলেন। ভগবান তৎপরে অসুরদিগকে সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু দেবতারা যেমন এক দিকে ধর্ম্মের সীমা অতিক্রম করেন, অসুরেরা তেমনই অধর্ম্মের চরম অবস্থায় পতিত হয়। সুতরাং তাহাকে সৃষ্টিরক্ষার জন্য দেব ও অসুর ভাবের বিমিশ্রীকরণ করিয়া মানব সৃষ্টি করিতে হইল। এই মানবের পক্ষে পূর্ব্বতন ত্রিদেব—বরুণ, মিত্র ও ইন্দ্র—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব নামে অভিহিত হইলেন। এই ত্রিদেবই বাইবেলের মতে ত্রিনীতি। ইঁহাদিগের মধ্যে নামানুসারেই দেখা যায় যে মহাদেব শ্রেষ্ঠ।

মহাদেব মহাযোগী ছিলেন। তিনি সমদর্শী,—অমৃত ও হলাহল তাঁহার নিকট দুইই সমান, শ্মশান ও রাজপ্রাসাদ উভয়ই তুল্য মূল্য বহন করিত। তিনি গৃহ ছাড়িয়া শ্মশানে, মশানে, কাননে, গিরিগহ্বরে, হৃদয়ের শান্তি ও তৃপ্তিলাভের জন্য পরব্রহ্মের আরাধনা করিয়া বেড়াইতেন। তিনি ত্রিনয়ন। দুইটি নয়ন বাহ্যজগৎ ও তৃতীয়টী অন্তর্জ্জগৎ দৃষ্টি করিবার জন্য। তিনি পঞ্চানন। চারি মুখে চারি বেদ ও পঞ্চম মুখে ভগবানের গুণ গান করিতেন। তিনি সিদ্ধিতে বড় পটু ছিলেন—যোগীর সিদ্ধিলাভই পরম বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু এ প্রকার মহাযোগী হইয়াও তিনি প্রেম ও ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন নাই। কেবল শুষ্কহৃদয়ে কঠোর তপস্যা করিতেন। এরূপ যোগীর হৃদয় শুষ্কতায় পরিপূর্ণ হইলে সংসারের অনিষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বিধাতা দক্ষপ্রজাপতির কন্যা পবিত্র ও জীবন্তপ্রেমরূপিণী সতীর সহিত তাঁহার পরিণয় সংঘটন করিলেন। মণিকাঞ্চনের যোগ হইল, গঙ্গাযমুনা একত্র সম্মিলিত হইল, সাধকের হৃদয়ে প্রেম ও ভক্তির উদয় হইল, শুষ্ক মরুভূমিতে শতমুখী নদীর স্রোত আসিয়া পড়িল।

এ প্রকার মিলনের ফল যে মধুর হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? এ প্রকার যোগে যে সুফল জন্মিল তাহা গণপতি। এই পরিণয়ে গণপতির জন্ম হইল। তিনি চারি বেদে পারক, বিদ্যাবিশারদ এবং সুপণ্ডিত। তাহার ন্যায় পণ্ডিত তৎকালে আর কেহই ছিলেন না। কিন্তু মনুষ্যের অহঙ্কার নিতান্ত দুর্দ্দম্য। পাছে এত জ্ঞানের সহিত গর্ব্ব আসিয়া পড়ে, এই জন্য তাঁহার স্কন্ধে গজমুণ্ডের আরোপ হইল। হস্তী বিস্তরপরাক্রমশালী বটে, কিন্তু তাহার চক্ষু অতিক্ষুদ্র বলিয়া আপনার বিপুলশরীর দেখিতে পায় না, সুতরাং বিপুলদেহের ও পরাক্রমের অধিকারী বলিয়া গর্ব্বিত হয় না এবং বুদ্ধি ও জ্ঞানের বশ্যতা স্বীকার করে। আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করাই মহত্তের কার্য্য। বিজ্ঞান বিশারদ নিউটন্ (Newton) বলিতেন যে, তিনি বিজ্ঞানসমুদ্রের কূলে লোষ্ট্র সংগ্রহ করিতেছিলেন মাত্র। যে আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করিল না, তাহার কিছুই শিক্ষা হয় নাই। গণপতি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং অতি নম্র ও ধীরপ্রকৃতি। মূষিক আবার তাঁহার বাহন হইল। মূষিক বিশেষ উপকার করিত, কেন না সে দেখাইত যে যাহার উপরে জন্তুপ্রধানের মুণ্ড, তাহারই নিম্নে অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য জীব —যেমন বিদ্যা, বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্য, তেমনই নম্রতা। এই কারণেই গণপতি সর্ব্বজনপূজ্য। বস্তুতঃ জগতে গুণের আদর থাকিলে ইহার অন্যথা ও হইতে পারে না। আর্য্যেরা গুণের আদর বুঝিতেন বলিয়াই গণপতি সকলেরই পূজ্য।

তৎপরে ষড়াননের জন্ম হয়। ষড়ানন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তিনি কি প্রকার যুদ্ধ করিতেন? তরবারিচালন করিয়া কি পৃথিবীকে শোণিতধারায় প্লাবিত করিতেন? তাহা নহে। তিনি সংসারসংগ্রামে ঘোরঅত্যাচারী ষড়রিপুনামক শত্রুদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন। তৎকালে আর্য্যেরা যোগসাধনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, সুতরাং যে মহাত্মা যোগের এরূপ বিষম শত্রু অর্থাৎ ছয়রিপুকে পদানত করিলেন, তাঁহাকে যে সেনাপতিপদে বরণ করিবেন তাহা বিচিত্র নহে। ষড়ানন ময়ূরবাহনে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন। হৃদয়ে পাপরূপ কালমেঘ উদয় হইলেই তাঁহার বাহন শিখী আনন্দে নৃত্য করিত। ষড়ানন অমনি সতর্ক হইয়া জ্ঞান ও বিবেক এই দুই আয়ুধ দ্বারা তাহার ধ্বংস করিতেন। ময়ূর আর একটী কার্য্য করিত এবং তাহা সামান্য কার্য্য নহে। সে কুচিন্তারূপ সর্পদিগকে সম্মুখে পাইলেই গ্রাস করিত—সর্পই ময়ূরের ভক্ষ্যদ্রব্য। ময়ূরবাহন আরও একটী শিক্ষা দিত। ষড়াননের অশেষ গুণ ময়ূরের পাখার নানাবিধ বর্ণচাতুর্য্যমধ্যে প্রকাশিত ছিল, কিন্তু যখনই তাহার পদদ্বয়ের দিকে দৃষ্টি পড়িত তখনই এই মনে উদয় হইত, কিসের অহঙ্কার? কিসের গৌরব? যাহার ভিত্তি এত কদর্য্য, তাহার সৌন্দর্য্য কোথায়? যাহা পার্থিব, তাহাই অনিত্য। পূর্ণতালাভ মনুষ্যের সীমার বহির্ভূত। সুতরাং ষড়ানন বিনীতবদনে সেই পূর্ণতার আভাসমাত্র লক্ষ্য করিয়া জগতে বিচরণ করিতেন ও শিক্ষা দিতেন যে পূর্ণতা জগতে অসম্ভব। পূর্ণতা কেবল একজনেই আছে।

ক্রমে কাল গত হইতে লাগিল। দক্ষপ্রজাপতি যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তিনি মহাদেবের গুণে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন না—শিব যজ্ঞের সূচনা

করিলেন। ইহার ফলও অশিব অর্থাৎ অমঙ্গল ও দুর্ঘটনা। যাহার মূলে শিব নাই, তাহা কখনই মঙ্গল প্রসব করে না। এদিকে শ্মশানবাসী বৈরাগীর মনে ভক্তি ও প্রেম অধিক দিন স্থান পাইল না। তিনি কঠোর শুষ্ক তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন, তাঁহার হৃদয় হইতে প্রেম বিদূরিত হইল— দক্ষপ্রজাপতির যজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রেমের স্রোত মন্দীভূত হইল, মহাদেব লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। যে অমৃতের সংযোগে অমৃতের আকর সেই অমৃতধামে যাইতে পারিতেন, তাহা হারাইলেন, তাহার পদস্খলন হইল। কি হারাইলেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া প্রেম ও ভক্তির শব-মাত্র সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া দেশে দেশে ফিরিলেন। যোগী, ভক্ত ও সাধকদিগের পদস্খলন হইলে তাঁহাদিগের এইরূপ অবস্থাই ঘটিয়া থাকে। মানব সামান্য অর্থনাশে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, মহাদেব প্রেমধনে বঞ্চিত হইয়া, হৃদয়ের শান্তিহারা হইয়া যে উন্মাদ হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? মহাদেব বঞ্চিত হইলেন বটে কিন্তু সতীদেহচ্ছেদ করিয়া ভগবান সেই মূর্ত্তিমতী প্রেম জগতে বিলাইবার অভিপ্রায়ে সর্ব্বত্র তাহার অংশ বণ্টন করিয়া দিলেন। সতীদেহ একপঞ্চাশৎ স্থানে অংশে অংশে পতিত হইল এবং সেই সেই স্থান মহাতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইল।

শিব শূন্য-হৃদয়ে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার হৃদয়ে যে প্রেমের আভাসমাত্র ছিল তাহা বিলুপ্ত হইল; সতী তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। কিন্তু জগৎ প্রেম শিক্ষা পাইল, তীর্থসকল স্থাপিত হইল। মহাদেব আবার শূন্য-হৃদয়ে গৃহে ফিরিলেন। গৃহে ফিরিলেন বটে, কিন্তু গৃহে থাকিতে পারিলেন না। ঈশ্বরপ্রেমের ছায়া হৃদয়ে পড়িলেই মানব বৈরাগী হয়। এই জন্য ঈশা বৈরাগী, চৈতন্য বৈরাগী। মহাদেব আবার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু প্রেমের রাজ্যে কি অপ্রেমিকের স্থান আছে? ভগবান প্রেমের উৎস। যে অপ্রেমিক তাহার পক্ষে তাহার রাজ্যের দ্বার চিরুরুদ্ধ। মহাদেব ঘোর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন—পাষাণ ভেদ করিয়া প্রেমবারি বিনির্গত হইল। বিধাতা সদয় হইলেন—মহাদেবের হৃদয়ে ক্রমে প্রেমের সঞ্চার হইতে লাগিল। প্রেম উমাবেশে, ধীরে ধীরে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে, তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। মহাসাধকের কপাল প্রসন্ন হইল। ঘোর তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে স্বর্গীয় জ্যোতির আভা বিকীর্ণ হইতে লাগিল। শুষ্কতার স্থান প্রেমবারি সিঞ্চিত হইল।

মহাদেব আবার ক্রমশঃ প্রেমের রাজ্য অধিকার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শেষ পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল। স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণকে বার বার অগ্নিদগ্ধ করিয়া পরিশেষে আবার শেষপরীক্ষা করে, সেইরূপ মহাযোগী এই সংসার-প্রলোভন হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইয়াছেন কি না—না পাইলে মুক্তি হয় না—দেখিবার জন্য কামের অবতারণা হইল। প্রলোভন সাধকের সহিত শেষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু প্রেমের বন্যা আসিয়া যাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিতেছিল, স্বর্গীয়ভাব যাঁহার হৃদয়ে স্ফুরিত হইতেছিল, মুক্তি ও নির্ব্বাণদ্বার যাঁহার নিকট প্রায়-উন্মুক্ত হইয়াছিল, প্রলোভন আর তাঁহার কি করিতে পারিবে? সেই অতুল প্রেমের ছায়া যে হৃদয়ে পতিত হইয়াছিল, সেই অসীম অনন্ত প্রেম যে হৃদয় ধারণ করিতে

সমর্থ হইযাছিল. পার্থিব কলুষিত প্রেম কি আব সে হৃদযে স্থান পায ? প্রেমের স্রোতে প্রলোভন ভাসিযা গেল, অনন্ত তেজে ক্ষুদ্রমদন ভস্মীভূত হইল। শঙ্কট সময উপস্থিত। মহাদেবের জ্ঞানচক্ষু সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইল। মহাবিষুবসংক্রম যোগ উপস্থিত হইল। সম্মুখে প্রেমের রাজ্য —কি মধুর। কি অতুল! কত অসীম! কেমন সুন্দর! কি রমণীয়। সাধকের হৃদয প্রেমে প্লাবিত হইল, কঠোর শুষ্ক তপস্বীর হৃদযে প্রেমের বন্যা আসিল ; হরপার্ব্বতীর—বা কঠোরতপস্যার সহিত প্রেমের—মিলন হইল। জগতে প্রেমের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইযা মহাদেব জীবন্মুক্ত হইলেন।

পুরাণ ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্রে এ প্রকার চমৎকার দৃষ্টান্ত বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায। যেখানে কেবল শুষ্ক কঠোর তপস্যা, সেইখানেই নিষ্ফল লাভ, যেখানে প্রেমের অভাব সেইখানেই সিদ্ধির অসম্ভাব। যত দিন না জীব প্রেমসাগরে নিমগ্ন হইবে, যত দিন মনুষ্য কেবল প্রেমহীন ধর্ম্মের কঠোরভাব অনুসরণ করিবে, ততদিন জগতের মঙ্গল নাই। প্রেমিক না হইলে—মহাদেবের ন্যায প্রেমিক না হইলে—কিছুতেই মঙ্গল হইবে না। প্রেমের অভাবেই জগতের দুর্দ্দশা, ভারতের এই জঘন্য অবস্থা। যে দিন প্রেমের বন্যা ভারতকে প্লাবিত করিবে সেই দিন ভারতের সুখসূর্য্য পুনরায উদিত হইবে। ভারতের মুক্তিপথ পরিষ্কৃত হইবে। নতুবা প্রেমের অসদ্ভাবে যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই চিরস্থায়ী হইযা থাকিবে।

শ্রীজানকীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ব্যবহারিক ধন।

সংসারে যাবতীয জীবেরই অল্প অথবা বিস্তর অভাব আছে। জীবনধারণ করিবার জন্য জীবের যাহা যাহা প্রয়োজন, তৎসমুদাযই তাহার প্রাকৃতিকদেহে বর্ত্তমান নাই,—অর্থাৎ জীবন ধারণ করিতে আহার্য্য পানীয় প্রভৃতি যে সকল পদার্থের আবশ্যক, তাহা জীবমাত্রকেই আহরণ করিয়া লইতে হয়। ফলতঃ জীবকুলের দুঃখ ও সুখ তাহাদের প্রাকৃতিক অভাব ও সেই অভাব বিমোচনের উপর নির্ভর করে। যাহার অভাব অধিক এবং প্রায় সকল অভাব মোচনেরই উপায় বিদ্যমান, তাহাকে অধিক দুঃখভোগ করিতে হয় না, সুতরাং তাহাকে সুখী বলা যায। কিন্তু যাহার অভাব অধিক এবং অধিকাংশ অভাব মোচনের উপায় বা ক্ষমতা নাই, সে অত্যন্ত দুঃখী।

মনুষ্য জ্ঞান, চিন্তা ও স্মৃতিবিশিষ্ট ; সুতরাং অভাবজাত সুখদুঃখ তাহাকে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে আনন্দিত বা ব্যথিত করে ; এবং যে পরিমাণে তাহার আনন্দ বা ব্যথা উৎপন্ন হয়, সেই পরিমাণে সেই আনন্দ বা ব্যথার আকর যে অভাব তাহার হ্রাসবৃদ্ধির জন্য উপায় উদ্ভাবন করে। অর্থাৎ মনুষ্যের যখন যাহা প্রয়োজন হয়, নিতান্ত অসম্ভব না হইলে তখনই তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য উপায় বিধান করিতে বাধ্য

হইয়া থাকে। এই জন্যই কথিত হইয়াছে যে, "অভাবই আবিষ্কারের আদি কারণ"। সমাজসংগঠনের প্রাথমিক অবস্থায় যখন লোকে দেখিল যে, এক ব্যক্তির জীবনধারণের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা সে একাকী আহরণ করিতে সম্যকরূপে সক্ষম নহে এবং কিয়ৎপরিমাণে সক্ষম হইলেও তাহা সুবিধা-জনক নহে, তখন যাহার যে দ্রব্য প্রচুর আছে সে তদ্বিনিময়ে অন্যের যাহা প্রচুর আছে তাহা গ্রহণ করিতে শিখিল। ইহাতে উভয়পক্ষেরই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার অর্থাৎ অভাব মোচন করিবার পথ পরিষ্কার হইয়া আসিল। কিন্তু এ প্রকার বিনিময়ে সকললোকেরই সকলদ্রব্য প্রাপ্ত হইবার সুবিধা হইল না এবং এমন অনেক লোক দেখা গেল, যাহাদিগের অভাব বিস্তর কিন্তু সামগ্রী কিছুই নাই, কেবল শরীরের সামর্থ্যমাত্র আছে। পক্ষান্তরে আবার এমন লোকও দেখা গেল যে, তাহাদিগের কোন সামগ্রীরই প্রয়োজন নাই, কেবল কৃষিকার্য্য করিবার জন্য শ্রমের প্রয়োজন। ক্রমে শ্রমের বিনিময়ে লোকে সামগ্রীগ্রহণ করিতে এবং অন্যব্যক্তির নিকট হইতে সেই সামগ্রীর বিনিময়ে স্বীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিতে শিখিল। কিন্তু একদ্রব্য কত পরিমাণে দিলে অন্য দ্রব্য কত পরিমাণে পাইবে, তাহা সকল সময়ে স্থির করিয়া উঠা কঠিন বলিয়া বোধ হইল এবং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে দ্রব্য সকল বহন করিবারও অসুবিধা জন্মিল, কেন না যাহার যাহা আবশ্যক সে আপন বাসস্থলের নিকটেই সকল সময়ে যে তাহা পাইবে, এমন ঘটে না। এতদ্ভিন্ন আর এক অসুবিধা ঘটিল এই যে, যে কোন দ্রব্যের বিনিময়েই লোকের আপন প্রয়োজনীয় সামগ্রী মিলে না। আমার ক্ষেত্রে চাউল উৎপন্ন হয়, কিন্তু আমার বস্ত্রের প্রয়োজন, আর যাহার বস্ত্র আছে তাহার চাউলের প্রয়োজন নাই, তাহার ইন্ধনের প্রয়োজন। এমত স্থলে বস্ত্রের জন্য এরূপ ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে হইল, যাহার ইন্ধন আছে এবং যাহার চাউলেরও প্রয়োজন বটে। তাহাকে চাউল দিয়া তাহার ইন্ধন লইতে হইল এবং সেই ইন্ধনের বিনিময়ে আমাকে বস্ত্র পাইতে হইল। এই প্রকারে সমাজের আদিম অবস্থায় বিনিময় প্রথা যৎকালে প্রচলিত ছিল, তখন নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। এই হেতু তখন এমন এক দ্রব্যের অভাব বোধ হইল যাহার বিনিময়ে সকলের নিকট হইতে সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে এবং সকলেই সেই দ্রব্যের বিনিময়ে আপন আপন প্রয়োজন মত সামগ্রী পাইয়া অভাব-জনিত দুঃখ দূর করিতে পারে, অথচ তাহা দেশদেশান্তরে লইয়া যাইতে হইলেও কোন প্রকার অসুবিধা না জন্মে। সে দ্রব্য কি? গৃহপালিতপশুগণই তখন সেই দ্রব্যস্বরূপ স্বীকৃত হইল। যেহেতু স্থানান্তরে লইয়া যাইবার পক্ষে পশুগণই উপযুক্ত; বহন করিবার কষ্টভোগ করিতে হয় না। তদ্ভিন্ন পশুগণের দ্বারা ক্ষেত্রকর্ষণ, ভারবহন প্রভৃতি বিস্তর উপকার লাভ হয়। এই সকল বুঝিয়া তৎকালে পশুবিনিময় দ্বারা সকলে সকল প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু পশুগণের মৃত্যু বা বার্দ্ধক্যে ধনের নাশ সর্ব্বদা সম্ভব দেখিয়া লোকে তদপেক্ষা অধিক উপযোগী পদার্থের আবশ্যকতা অনুভব করিতে লাগিল। কালে এই অভাবেরও মোচন অর্থাৎ মুদ্রার সৃষ্টি হইল।

প্রথমে অর্থের আকার যেমনই থাকুক না কেন, যত দিন হইতে ধাতুতে পরিণত হইয়াছে, তত দিন হইতেই বিনিময়ের সুবিধা হইয়াছে বলিতে হইবে। কেন না ধাতু সহজে নষ্ট হয় না এবং সহজে প্রাপ্যও নহে। মূল ধনের ধাতু এ প্রকার হওয়া আবশ্যক, যাহা সহজে প্রাপ্য নহে এবং অধিক দুষ্প্রাপ্যও নহে। সহজপ্রাপ্য হইলে তাহার মূল্য অল্প হইবে, অর্থাৎ অনেক পরিমাণে না দিলে অন্য দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইবে না, সুতরাং সহজে স্থানান্তর করিবার ও সুবিধা হইবে না। যদি লৌহনির্ম্মিত মুদ্রা প্রচলিত হইত, তাহা হইলে যে প্রকার অসুবিধা হইত, তাহা চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ফলতঃ মুদ্রার ধাতু সহজপ্রাপ্য হইলে অসুবিধার বিশেষ বিমোচন হয় না। পক্ষান্তরে তাহা নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হওয়াও সুবিধাজনক নহে। যে হেতু মুদ্রার ধাতু নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইলে মুদ্রার আকৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইবে। আকৃতি ক্ষুদ্র হইলে সহজে হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। ইহা ভিন্ন তদ্দ্বারা সামান্যপরিমাণের দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় ও ঘটিয়া উঠিবেনা। হীরক অতি দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী। হীরক যদি প্রচলিত বা সাধারণ ব্যবহারিক অর্থ হয়, তাহা হইলে অসুবিধার অবধি থাকে না। এই জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রই আমাদিগের মুদ্রার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক ধাতু। হীরকাদি প্রস্তর সকল বহুমূল্য বটে, কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা বিনিময়ের কার্য্য চলিতে পারে না; তাহার কারণ এই যে, হীরকের মূল্যের স্থিরতা নাই, সহজেই হারাইয়া যাইতে পারে এবং তদ্দ্বারা অল্পপরিমাণ দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় চলিতে পারে না। যাহার মূল্যের স্থিরতা আছে, সহজে স্থানান্তর করা যায়, নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে এবং যদ্দ্বারা সকলপরিমাণ দ্রব্যেরই ক্রয় বিক্রয় চলিতে পারে, তাহাই প্রচলিত মুদ্রার উপযোগী সামগ্রী। কিন্তু এক প্রকার ধাতুতে সকল প্রকার গুণ থাকা সম্ভব নহে বলিয়া, প্রায় সকল দেশেই পূর্ব্বোক্ত তিনটী ধাতুতে মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যাহাতে ধাতুতে বিস্তর পরিমাণে খাদ মিশ্রিত করিয়া সাধারণের প্রবঞ্চনা করিবার সুবিধা না হয় এবং পরিমাণে অল্পধাতু দিয়া ধার্য্যপরিমাণের ধাতু দিলাম বলিয়া লোকে প্রতারণা করিয়া সেই ধার্য্যধাতুর বিনিময়োচিত সামগ্রী লইতে না পারে, এমন উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। এই জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ও খাদ যুক্ত করিয়া মুদ্রা সকলকে পরস্পর সকলবিষয়ে সমান এবং কোন বিশেষ চিহ্নের দ্বারা অঙ্কিত করা হয়। সচরাচর মুদ্রায় সিংহাসনাধিরূঢ় রাজা বা রাজপ্রতিনিধির নামই অঙ্কিত হইয়া থাকে।

যেমন দ্রব্যের পরিমাণ অর্থাৎ কোন এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কত গুণ বা কত অংশ চিরকালই সমান, তেমনই মুদ্রারও খাদ এবং পরিমাণ সমান হওয়া আবশ্যক। ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রা প্রচলিত হওয়াতে এই সুবিধা আছে যে, একবার কোন ধাতুতে যে খাদ মিশ্রিত হয় সে খাদের আর হ্রাসবৃদ্ধি এবং (বিস্তর ব্যবহার ব্যতীত) ধাতুর ওজনেরও তারতম্য হয় না। ধাতু অনেক দিন থাকিলেও সময়ের দ্বারা বড় শীঘ্র নষ্ট হয় না। যে ধাতু এ প্রকার শীঘ্র নষ্ট হয়, তাহা মুদ্রাগঠনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে। ধাতুমুদ্রা অনেক দিন থাকে বলিয়া তদ্দ্বারা কোন বিশেষ দেশের, রাজার এবং কিরৎপরিমাণে

তদ্দেশের ভাষাবও ইতিহাস পাওযা যাইতে পাবে।

ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রা ব্যতীত আবও কয়েক প্রকার ধন আছে, যেমন নোট, হুণ্ডী, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি। কিন্তু ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রাব মূল্যসম্বন্ধে যেমন আদর এবং প্রয়োজনীয়তা, ইহাদিগেব তেমন নহে, কেন না ইহাদিগেব মূল্য হইতে দেশবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষ ভিন্ন, সাধারণের ক্রয়বিক্রযেব সুবিধাজনক নহে এবং এসকল যাহাদিগের পক্ষে সুবিধাজনক, তাহাদিগেব দ্বাবাই ব্যবহৃত হইবার সামগ্রী। যদি ও একদেশের মুদ্রা অন্যদেশে চলে না, অর্থাৎ তদ্দ্বারা ক্রয বিক্রয় কবা যাইতে পারে না, তথাপি সেই মুদ্রাব ধাতুতে দ্বিতীয দেশেরও মুদ্রা প্রস্তুত হয বলিযা এবং ধাতুর প্রযোজনীযতাবশতঃ তাহা একখানি নোট অপেক্ষা সহজে বিক্রীত হইবে। নোটখানি যে দেশেব বা যে সময়েব সেই দেশে বা সেই সময়ে ব্যতীত আর কোথা ও কখন চলিবে না; কিন্তু মুদ্রা তদ্রূপ নহে, অর্থাৎ মুদ্রার ধাতুতে অন্য মুদ্রা প্রস্তুত হইতে পারে এবং অন্য প্রয়োজনে লাগে বলিয়া তাহা সহজে বিক্রেয।

মূল্য সম্বন্ধে নোটের কিছুই না থাকিলেও তাহাব প্রয়োজনীয়তা এবং সুবিধা বিস্তর। নোটের নিজের কিছু মূল্য নাই সত্য, কিন্তু নোটের লিখিত মূল্য বাজকোষ হইতে দিবাব অঙ্গীকার আছে বলিযা সেই বাজার বাজ্যের বা তদধিকৃত স্থানেব সর্ব্বত্র চলিয়া যায়। আবার রাজকোষ হইতে যতমূল্য মুদ্রাকারে দিতে পাবা যায়, তাহার অধিক মূল্যের নোট প্রচলিত হইতে পারে, কেননা নোটের অধিকারী সকললোকেই কিছু এককালে মূল্য লইতে উপস্থিত হয় না। অতএব রাজকোষে যে মুদ্রা সর্ব্বদা থাকা সম্ভব, তাহাতে প্রাত্যহিক নোটবিক্রেতাদিগেব কুলান কবিতে পাবিলেই, সাধারণেব পবস্পবেব ব্যবহার জন্য বিস্তবমূল্যের নোটের প্রচলন হইতে পারে। এই উপাযে সাধাবণেব ব্যবহাবেব জন্য যত মুদ্রাব প্রযোজন, তত মুদ্রা প্রস্তুত কবিবার ব্যয কুলান করিতে না পারিলেও রাজকীয়সুবিধাব বিধান হইযাছে এবং সাধাবণেবও উপকার হইযাছে। মুদ্রা স্থানান্তবকরণেব যে অসুবিধা, ব্যবহাবে হ্রাস হইয়া যাইবার যে সম্ভাবনা এবং সহজে নষ্ট হইবাব যে আশঙ্কা, তৎ সমুদায়ের কিছুই নোটে নাই। দশ সহস্র বা ততোধিক মুদ্রার দ্বাবা যে কার্য্য হইতে পাবে, এক খণ্ড কাগজের দ্বাবা তাহাই হইযা থাকে, কিন্তু দশ সহস্র বা তদধিক মুদ্রার পক্ষে যে অসুবিধা, তাহা এই কাগজখণ্ডে নাই। কোন বিশেষ বাজ্য মধ্যে সর্ব্বত্রই ইহাব সমান মূল্য; নষ্ট হইলেও পুনঃপ্রাপ্তির পথ আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নোটেব দ্বাবা সাধাবণের বিশেষ উপকার হইযাছে।

প্রথমে নোট কেবল ব্যবসাযিদিগের জন্য এবং ব্যবসাযিদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। একস্থানের একজন ব্যবসাযীর অন্য স্থানে অর্থের প্রয়োজন হইল; নূতন স্থানের ব্যবসাযিদিগেব সহিত তাহার দেনা পাওনা নাই, সুতবাং তাহাব পক্ষে রাশীকৃত মুদ্রা বহন করা ব্যতীত উপায ছিল না। কিন্তু সে দেখিল যে, সে যেস্থানে ব্যবসাযকার্য্য করে, সে স্থানের অন্য একব্যক্তি উভয়স্থানেই ব্যবসায়কার্য্য কবিয়া থাকে। এই ব্যক্তির নিকট যদি তাহার কিছু পাওনা না থাকে তাহা হইলে তাহাকে টাকা দিয়া তাহার নূতন স্থানের কর্ম্মচারিদিগের উপর এমত অনুজ্ঞা

লইতে পারে যে,এ প্রকার এক ব্যক্তিকে এত টাকা দিবে। অতএব সে এই সহজ উপায় অবলম্বনে যত্নবান হইল এবং এই প্রকারে ক্রমে সাধারণ ব্যবসায়িদিগের মধ্যে এই অনুমতিপত্র প্রচলিত হইল। এক স্থানের কতিপয় বিশ্বাসী মহাজন অন্য স্থানের মহাজনদিগের সহিত, দেনা পাওনা না থাকিলেও, এই প্রকারে অনুমতিপত্র বাহির করিতে ও টাকা দিতে আরম্ভ করিল। যে সকল মহাজন কেবল টাকা ও নোট প্রভৃতির কার্য্য করিত, প্রথমে এই কার্য্য তাহাদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এ দেশেও রাজকোষ হইতে এই প্রকার নোট বাহির করিবার পূর্ব্বে যে সকল মহাজন কেবল টাকা ও নোট প্রভৃতির কর্ম্ম করিত (অর্থাৎ ব্যাঙ্ক), এ প্রকার কার্য্য তাহাদিগের দ্বারাই সম্পন্ন হইত।

কোন কোন দেশে, কাগজ ও চর্ম্মের কাগজ ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে, তাম্র রৌপ্য প্রভৃতি নোটের কায করিত। ইহাতে বিস্তর অসুবিধা ও ব্যয় বলিয়া এ রীতি ক্রমে উঠিয়া গিয়াছে।

তাম্র, রৌপ্য এবং স্বর্ণনির্ম্মিত মুদ্রা, নোট ও পোষ্টাল নোট এই কয়েকটী আজকাল আমাদের দেশের সাধারণ ব্যবহারিক ধন। এতদ্ভিন্ন ষ্ট্যাম্প কাগজ (Revenue stamps), ডাকের টিকিট (Postage stamps) প্রভৃতি কোন কোন স্থলে ধনের ব্যবহার ও প্রয়োজনসিদ্ধ করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদিগকে সাধারণতঃ ব্যবহারিক ধন বলা যাইতে পারে না। রাজদ্বারে অভিযোগ বা আবেদন করিবার অথবা কোন স্থানে পত্র বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য ব্যতীত সে ধন অন্য প্রয়োজনে লাগে না; লাগিলেও পোষ্টাল নোটের ন্যায় তাহাতে কমিসন ধরিয়া দিতে হয়।

এই কয়েক প্রকার ব্যবহারিক ধন ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার ধনের আকার দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন—হুণ্ডী, কোম্পানির কাগজ, অংশপত্র ইত্যাদি। ইহাদিগের দ্বারা অন্য প্রয়োজনসিদ্ধ হয়; অতএব স্বতন্ত্র নামে প্রস্তাবান্তরে ইহাদিগের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

ষড়ানন্দের রোজনামচা।

ইল্‌বার্ট্‌ বিলের জন্মান্তরপ্রাপ্তি।

(কতিপয় অধ্যায়।)

ডিসেম্বর মাসের শেষভাগ। সাহেবদের বড়দিনের বড় আমোদ উপস্থিত। বড় দিনের আমোদ, প্রদর্শনীর আমোদ, ডিউক্‌ আসার আমোদ;—শীতঋতুর গাওনা বাজনা, খানা, প্রেম, প্রমোদ, পুলি পিষ্টক,—সকল গুলি একত্রে উপস্থিত! ভারতে অর্থেরও অভাব নাই, সম্ভোগের উপকরণও অনন্ত! কিন্তু হায়! 'হৃদে জ্বলিছে কেবল, নিদারুণ

রিপনের বিলের অনল। সাহেবেরা কিছুতেই সুখ পাইতেছেন না, কিছুতেই আয়েষ অনুভব করিতেছেন না। শ্বেতাঙ্গিনীগণের সুখদ সংমিলনে পরিতৃপ্ত হইতেছেন না। সমগ্র ভারত কালিমাময়। কালা মাজিষ্ট্রেটের অস্পৃশ্য ছায়া সকল দ্রব্যে প্রতিভাত। শ্বেতাঙ্গদিগের ন্যায় সুশীলা শ্বেতাঙ্গিনীগণও বিলের নিদারুণ স্মৃতিনিপীড়িতা—অবসাদময়ী। আজ পাঁচ সপ্তৎসরকাল 'জিঙ্গ'তনয়গণ ইল্‌বার্ট্‌ বিল সঞ্জাত হলাহলে জর্জ্জরীভূত। তর্জ্জন, গর্জ্জন, লঙ্ঘন, উচাটন, বশীকরণ, আঁচোয়ন, কামড়ানাদি নানবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক, বৈদিক ও তান্ত্রিক বহুবিধ মন্ত্রৌষধির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শ্বেতদ্বীপে দূত প্রেরিত হইল। ভগবান বৃহনিসন ও আততিকিনীসূদন প্রভৃতি যাজ্ঞিকগণ বৃটিসসিংহ জাগাইতে লাগিলেন। যাগ-যজ্ঞ হোম, সভা স্বস্ত্যায়ন, সন্তানাবাধণের পুঁথি, ঝাড়ান কাড়ান কিছুই বাকী রহিল না। কিন্তু হায়। বৎসরেক গত হয়—কিছুতেই বিলরূপ বিষকুম্ভ অন্তর্হিত হইল না। নড়িল, পাশমোড়া দিল, কিন্তু অদৃশ্য হইল না। নির্মূল হইল না, জীবিত রহিল, জীবিত রহিল, জ্বালা মিটিল না।

'কৈলাস' হইতে বিপন নামিলেন। কালায় জয় গাইল, নিশান উড়াইল, হুলু দিল, বাজনা বাজাইল, চেরাগ জ্বালিল। কিন্তু ধন্য মর্ম্মাহত বিষের জ্বালায়। রিপনকে দেখিয়া আরও জ্বলিয়া উঠিল। বৃষ্টাবৃষ্টি করিল।

আজ দশমাস সাহেবেরা 'ঝাঁপানে' চড়িয়া নাচিতেছেন। তিলার্দ্ধের জন্য নামেন নাই। বিষ না নামিলে কিরূপে নামিবেন? কিন্তু দেখ। দেখিতে দেখিতে 'ক্রিষ্‌মাস' আসিয়াছে। মেরি ক্রিষ্‌মাস!! সাধের বড় দিন। প্রাণের কমলালেবু!! আদরের মর্ত্তমান কলা!!! কিন্তু মরি মরি। কে বড় দিন করিবে? কে কালাআদমীর ডালা লইবে? কে নেটিব কোয়াটারের কোরি কোই-মাছ খাইবে? আহা। যাঁহারা করিবেন, যাঁহারা খাইবেন, তাঁহারা ঝাঁপানের উপর,—নামিবেন না। কলিকাতা অন্ধকারময়। মেরি ক্রিষ্‌মাসের সময় কলিকাতা অন্ধকারময়!! ক্রিষ্‌মাস বৃক্ষ রোপিত হইল না। গির্জ্জার ঘড়ি বাজিল না। লাটের খানায় কেহ যাইল না। তিনি বহুদিন হইতে 'একঘরে'।

ছি ছি বিপন। তুমি খৃষ্টান হইয়া এমন কায করিলে? তুমি 'রোম্যানকেথলিক' হও, আর যাহাই হও, খৃষ্টান ত বটে? খৃষ্টান হইয়া মহাপ্রভু যীশুর উৎসবের হন্তারক হইতেছে? কেমন করিয়া তোমার স্বদেশীয়গণ আজ আনন্দোৎসবে যোগ দিবেন? তুমি কতকগুলা কাল মানুষের জন্য স্বজাতির মনকষ্ট দিতে বসিয়াছ? হায় হায়! মেরি ক্রিষ্‌মাস আজ তোমারই জন্য নিরানন্দ। ফুল্লকুসুমসন্নিভ বৃটিশললনাগণ অভিমানে শুকাইয়া গিয়াছেন। আজ এই ক্রিষ্‌মাস সপ্তাহেও তাঁহারা ম্লানমুখী। সারলোর পুত্তলী শিশুরাও 'ব্লাক সিবিলের' আতঙ্কে অবসন্ন। কে আর, বল, তবে ক্রিষ্‌মাসে নাচিবে?—আমোদ করিবে? কিন্তু দেখ, ইহাও বলিতেছি—ক্রিষ্‌মাসের দিন এঙ্গলোইণ্ডিয়ানগণ যে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইতেছেন,—নির্ঘাত অভিমানে উৎসর্গ হইতে বিরত রহিয়াছেন, ইহা বড় সোজা কথা নয়; ইহার ফল অচিরাৎ তোমাকে ও ভারতভূমিকে ভোগ করিতে হইবে।

* * * *

বৃদ্ধ কহিলেন "বৎস ইল্‌বার্ট্‌! তুমি সকলই জানিতেছ; সংরক্ষিণী সভার দূত 'পণ্ডিতবর' ইবান্স যাহা বলিয়া গেলেন তাহাও শুনিলে। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, বল দেখি। আমার মন নিতান্ত উচাটন হইয়াছে। 'মেরি ক্রিষ্‌মাস্‌'—আজ বৎসরকার দিন,—সকলই নিরানন্দ। আমি বা কোন প্রাণে—কি লইয়া—ক্রিস্‌মাস্‌ করি। তুমি বালক হইয়াও বিজ্ঞ ও দূরদর্শী। বেথারিজের মিসর গমনাবধি তুমিই আমার একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু, সহায় ও পরামর্শদাতা। বৎস,বল দেখি, এখন কিরূপ নীতি অবলম্বন করা যায়? নিরীহ ভারতসন্তানগণ,—ইহাদিগকেই বা আমি কেমন করিয়া এক্ষণ ত্যাগ করি? বিশেষতঃ ইহারা আমার একান্ত অনুগত। ইহাদিগকে আমি যাহা দিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা অতি সামান্য, কিছুই নয় বলিলেই হয়। কিন্তু তথাচ ইহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট—তাহাতেই অশেষ প্রকারে আমার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে,—সম্রাজ্ঞীর গুণগান করিতেছে। আহা, ইহাদের কি মধুর প্রকৃতি! তবে কি না আজ ক্রিষ্‌—

বৃদ্ধ কথা শেষ না করিয়াই নিরস্ত হইলেন। যুবক কোন প্রকার উত্তরপ্রদানে সমর্থ হইলেন না। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া স্থিরদৃষ্টিতে প্রবীনের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অদূরে রাজস্বসচিব প্রাজ্ঞ কল্‌বিন দণ্ডায়মান ছিলেন। ধীরে ধীরে—অতিধীরে—প্রতিনিধির সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, মহাত্মন্‌, আমি আপনার চিত্তের কারণ অনুভব করিয়াছি যদি অনুমতি করেন, আমি আপনার এই দুশ্চিন্তা অপনয়ন করিয়া কৃতার্থ হই।

প্রতিনিধি। (সচকিতে)—কি বলিলেন?

কল্‌বিন উত্তর করিলেন;—আমি সম্প্রতি মিসর হইতে আসিয়াছি। আমার নিকট অতি আশ্চর্য্য রাজনৈতিক মন্ত্র আছে। যদি আজ্ঞা পাই অতি সহজেই এই বিলঘটিত সমস্যার এমত ভাবে মীমাংসা করিতে পারি যদ্দ্বারা স্বজাতীয়গণ সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হইবেন, অথচ নেটিবদিগের নিকট আপনার মুখরক্ষা হইবে। সংক্ষেপতঃ বিলকে বিলও বজায় থাকিবে, অথচ উপস্থিত রাজনৈতিক সঙ্কটও বিদূরিত হইবে।

প্রতিনিধি। (হৃষ্টচিত্তে)—মহাশয়! আপনার যদি এমন ক্ষমতা, এতগুণ।—তবে যদ্দ্বারা সাম্রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত হয় এখনই তাহার চেষ্টা করুন। কিন্তু দেখিবেন যেন ভারত-সন্তান দিগের প্রতি অন্যায় না হয়।

কল্‌বিন।—অন্যায়? সে কি? ন্যায় অন্যায় আমি ভয়ানক বুঝি। অন্যায় কখনই হইবে না। মহাশয় বরং প্রত্যক্ষ করুন,—

এত কহি কল্‌বিন অপূর্ব্ব কৌশলে
ছাড়িল মৈসরি মন্ত্র 'ল্যাগ ল্যাগ' বলে';—
'ল্যাগ ল্যাগ' বলে' গুণী দিল তিন তুড়ী,
মুহূর্ত্তে বনিল এক অপূর্ব্ব গিচুড়ী',—
শ্বেতপক্ষে সুধা হৈল, কৃষ্ণের গরল,
এমন (ই) সে মন্ত্র আর শিক্ষার কৌশল!
বিলের বিলত্ব গেল—নামটী রহিল,
'স্বার্থসংরক্ষিণী সভা' মঞ্জুর করিল।

* * * *

অতঃপর কল্‌বিন কহিলেন, মহাভাগ! দেখুন, কি অপূর্ব্ব দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছি। রক্ষিণী সভা ইহাতে অপরিসীম তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণকায় মনুষ্যেরাও ইহাতে বড় কথা কহিতে পারিবে না. যেহেতু আমি

তাহাদের কথা কহিবার পথ রাখি নাই। মন্ত্রবলে আমি এই দ্রব্যের এমন অভূতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রকৃতি প্রদান করিয়াছি যে, নেটিবগণ ইহা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বুঝিবে। ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্তে একই ব্যক্তি ইহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিবে। অবশ্য কেহ মন্দ বলিবে, কেহ ভাল বলিবে, কিন্তু যে মন্দ বলিল, তৎপরক্ষণেই সে ভাল বলিবে। বাঙ্গালিরা রাজনৈতিক রহস্যে অধিক অগ্রসর বলিয়া পরিচয় দেয়। দেখিবেন তাহাদিগের নেতৃদলের মধ্যেই এ সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব উঠিবে, এক জন এক রূপ বলিবে না; নানা জনে নানা কথা কহিবে; সুতরাং কাহারই কথা শুনিবার আবশ্যকতা হইবে না। যাহাহউক মহাত্মন্! এ অতি অদ্ভুত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। স্বজাতীয়দিগের ইহা লাভ পর নাই সুস্বাদু হইবে। অতএব আপনি শুভদিনে শুভক্ষণে খৃষ্টোৎসবের পূর্ব্বাহ্ণেই ইল্‌বার্ট্ বিলের এই "মহামণ্ড" তাঁহাদিগকে 'ক্রিষ্‌মাস গিফট্' অর্থাৎ বড় দিনের উপঢৌকন দিন, খৃষ্টানজগৎ সংতৃপ্ত হইবে।

বৃদ্ধ কহিলেন, হে রাজসচিব! ভবদীয় মঙ্গল হউক, আপনি অতি উত্তম কথাই কহিয়াছেন। কিন্তু ভারতসন্তানের প্রতি অন্যায় না হয় এটী যেন লক্ষ্য থাকে। আর আপনি যে মন্ত্রবলে এই কাণ্ড করিলেন, তাহার আভাস পূর্ব্বেই আমি বোম্বাই হইতে পাইয়াছিলাম। কিন্তু তখন উহাতে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করি নাই। যাহা হউক সাবধান সাবধান, যেন অন্যায় অব্যবস্থা না হয়।

* * * *

চারি দিকে 'হুলুস্থুল'! 'কন্‌কর্ডাট'-রূপ ক্রিষ্‌ম্যাস্ 'গিফ্‌ট' পাইয়া ইংরাজশিবিরে জয়ঢক্কা বাজিতেছে! দেশময় আনন্দোৎসব কোলাহল। দৈত্যকুল জয়োল্লাসে উৎফুল্ল ও সুরারাগে রঞ্জিত হইয়া কহিতেছেন,—'আমরা যাহা পাইবার আশা করি নাই, তাহাও পাইয়াছি, ভয়ে তাহাও দিয়াছে। হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে হুর্‌রে! ড্যা-ড্যাম নিগার, চুপ রহ'।

পূর্ব্বাঞ্চল হইতে কেহ কেহ নাচিতে নাচিতে ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিলেন,—"আমরা যাহা পাইয়াছি তাহাতে পেট ভরিবে না। 'কন্‌কর্ডাট' কায়েমী হওয়া চাই। একবার চিরস্থায়ী হওয়া চাই"।

* * * *

ও দিকে ভারতসন্তানগণ কি করিতেছেন? প্রথমতঃ সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। বোম্বাই মান্দ্রাজ কোঁটাকতক চক্ষের জল ফেলিলেন। কথাটা কেহ বুঝিল, কেহ বুঝিল না। বাঙ্গালিরাও 'ঝক্কার' দিল। 'ছি ভাই! লাটসাহেবের এমন কায! যা'কে এত ভাল বেসেছিনু, হৃদয় পিঞ্জরে রেখেছিনু, সেই কিনা আজ সাধিল রে বাদ!'

বাঙ্গালী কপালে করুন হানিয়া প্রথম দিন খুব মাতিয়া উঠিল। "হ্যান্ করেঙ্গা, ত্যান্ করেঙ্গা"। কিন্তু সব 'করেঙ্গা, পূর্ব্ববৎ অজাযুদ্ধে পরিণত হইল। বিশেষতঃ আবার কলিনের মন্ত্রমাহাত্ম্য আছে। এই মাত্র যে 'বাম বাম' বলিতেছিল, পরক্ষণেই সে 'আল্লা আল্লা' আরম্ভ করিল! ক্ষণেক পূর্ব্বে যে কন্‌কর্ডাটের বিরুদ্ধে 'ভৈরবী ও নট-নারায়ণ' ভাঁজিতেছিল, তৎপরক্ষণেই দেখি, সে লক্ষ্ণৌ ঠুংরীতে 'গুপ্ত প্রেমের' গাঢ়তা গাইতেছে। ভারতমুকুরে একই চিত্রের ভিন্ন ভিন্ন ছায়া পড়িতে লাগিল। 'হিতৈষি'মহাশয় রকমওয়ারী সুরে রাজদরবারে কয়েক দিন

গাইয়া আসিলেন। বাঁড়ুয্যেমহাশয়ের সুর মাঠ পড়িল। গরিব বেচারা করিবেনই বা কি? বিশেষতঃ "যার মাকে কুমীরে খায়" ইত্যাদি।

কত জনে কত কথা বলিল। কেহ বলিল "আইন আমরাও জুরীর বিচার কামনা করি।" কেহ বলিল "তা যাক গতস্য শোচনা নাস্তি। কা কস্য পরিবেদনা? আইস এখন আমরা যাহাতে হাইকোর্টের সমস্ত জজিয়তিগুলি অধিকার করিতে পারি তাহার চেষ্টা করি। ভ্রাতৃগণ! কেন হইবে না? সাধিলেই সিদ্ধি!" বাহবা, বাহবা, বলিহারী যাই!

* * *

শুক্র সোম লাটের সভা বসিল। লম্বা লম্বা স্পীচ্। কলম কলম গলাবাজি। পর্ব্বত মূষিক প্রসব করিয়া দাপটে হুঙ্কার দিল। কেহবা 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত' গাইল। কেহ বলিলেন,"দেশীয় লোক বড় পাজী গণ্ড মূর্খ, ও অকর্ম্মণ্য। তাদের একটা বড়দরের বিচারক মান্দ্রাজে এক জন খুনে আসামীকে মোটে তিন মাসের মেয়াদ দিয়াছিল।" কেহ কহিলেন, 'ইংরাজের আমলে কথা কহা ও লেখার স্বাধীনতা পাইয়া বাঙ্গালিদের ভয়ানক স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে, তাহারা যা' খুসী তা'ই বলে,যা' খুসী তা'ই লেখে।' দাসমহাশয় দুই দিন দুই রকম বলিয়া আসিলেন। প্রথম দিনের কথা একটু পদে ছিল; দ্বিতীয় দিন "কৃষ্ণায় নমঃ"বলে' আহুতি দিয়া আসিলেন। অনেক 'কথা'কাটাকাটি, 'কানুন ছাঁটাছাঁটী' হইল। কেন হইল, ভগবানই জানেন! উপস্থিত যাহা ঘটিয়াছে, তাহার সহিত ঐ সকল কথাকাটাকাটীর বিশেষ কিছু সংস্রব ছিল, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এমত বোধ হয় না। খোদ লাটের ও ইল্‌বার্ট সাহেবের দুই প্রকাণ্ড বক্তৃতা। দুইয়ে একই কৈফিয়ৎ। কৈফিয়ৎ অবশ্য সাহেবদের নিকট। গবর্ণমেণ্ট 'ইল্‌বার্ট্ বিলের অবতারণা করিয়া প্রচণ্ড মহাপাপে পতিত হইয়াছিলেন! সে পাপের উৎকট প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, মস্তকমুণ্ডন করিয়া গোময় ভক্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু তথাচ কৈফিয়ৎ আবশ্যক! আরে বাপু, যা হইয়াছিল, তা'ত চুকিয়া গিয়াছে! তবে আর বাক্যের শ্রাদ্ধ কেন? বাক্যের বাঁধনে ভারতের যত স্বার্থ রক্ষা হইবার সম্ভাবনা তাহা বুঝা গিয়াছে! দেশের লোকগুলা হুজুকে মাতিয়া সম্বৎসর 'হরিবোল' দিতেছিল, 'জয়নাদন' নাদিতেছিল; 'কন্‌কর্ডাটের' পরেও ভাবিল যে, গবর্ণমেণ্ট কৌন্সিলে বসিয়া গুপ্ত ব্যাপারটার একটা 'নির্ঘণ্ট' করিবেন,সেটিবদিগকে একটা জবাব দিবেন। কিন্তু লাট সাহেবের বক্তৃতায় কি জবাব পাইল? পাইল "হত ইতি গজ"। সেই খিচুড়ী আর খিচুড়ী!

পরন্তু মশলা খাওয়াইবার জন্য, খিচুড়ী 'নির্ব্বাচিত সমিতির'হস্তে অর্পিত হইল। জনৈক দেশীয় চাচা 'মশালচী' ভিন্ন সকল গুলিই বিলাতীয় সুপকার; অতএব তাহা কোন প্রকারে সাহেবদিগের পক্ষে অনুপাদেয় হইবার সম্ভাবনা রহিল না।

অনন্তর কলিকাতার বাঙ্গালিবাবুদের কেহ কেহ চাগান দিলেন। টাউনহলে সভা করিলেন। মিঃ ডব্লিউ, সি বোনারজী 'কেদেরামনুষ্য' হইলেন। তিনি বলিলেন;— "Now that the compromise had been accepted and the pledge given by the Viceroy to that compromise, he thought that they should be doing

their duty to give their support to the Viceroy"

ঠিক। তা নৈলে কি গবর্ণমেণ্টের হাত পা চলে? গবর্ণমেণ্ট যেন বাঙ্গালি-বাবুদের supportএর অভাবে রক্ষিণী সভার সহিত চুক্তি পালন করিতে পারিতেছিলেন না! তা'ই তাঁহারা তাড়াতাড়ি টাউনহলে গিয়া সেই যুক্তি সমর্থন করিতে বসিলেন। মরি মরি! আমাদের কি সম্ভ্রমজ্ঞান! কি পুরুষার্থ! বিশেষতঃ চাচা বিলাতফেরত কি না? কাযেই এই দুইটা জিনিস তাঁহার কিছু অতিরিক্ত! বলি, রক্ষিণী সভার সহিত যখন বন্দোবস্তটা হয়, তখন কি আপনাদিগকে ডাকা হইয়াছিল না কি? আমরা যেন শুনিয়াছিলাম কাযটা আঁধারে আঁধারে হইয়াছিল। কিন্তু আপনারাই না 'কন্‌কর্ডাট্' দেখিয়া মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন?

* * * *

পরং ডিসেম্বরে মাসি, খৃষ্টমাসি পক্ষে, কৃষ্ণশুক্লসভ্যজনগণসমাকীর্ণ সমারোহসঙ্কুলব্যবস্থাপকাসরে, মঙ্গলবাসরে, স্বগোত্রায় 'গোত্রনার্ম্মণে' খিচরান্নমুৎসর্গীকৃতম্! এক ক্ষেত্রে দুই কার্য্য সমাধা হইল। শ্রীমদিল্‌বার্ট্ বিলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর তাহার প্রেতকৃত্য ও তৎসহিত উক্ত বিলের ভস্মাদিসঞ্জাত অভূতপূর্ব্ব জীবন্ত পদার্থের জাতকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইল। 'তিরোভাব ও আবির্ভাব' উভয়ই যথারীতি বিঘোষিত হইল। বাঙ্গালী বামাস্বরে কণ্ঠ কাঁপাইয়া একবার গাইল, "এত সাধের কালা গেল, কলঙ্ক গেল নারে সই।"

তার পর আর কি? 'প্রভাতে দশদিকে যাত্তি কার সঙ্গে কার দেখা শুনা।' ভারতীয় মনোবেগরূপ 'ফুসের আগুন' দুই মিনিট মধ্যেই নিবিয়া গেল। দেশীয় সংবাদপত্রসম্পাদক মহাশয়গণ প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে জারি করিলেন যে, তাঁহারা স্ব স্ব সেরেস্তায় 'গঙ্গাজলের ছিটা' দিয়া শুদ্ধ হইয়াছেন। শ্মশান বৈরাগ্যটা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলেই, আর একটা 'তুজুক' আশ্রয় করিয়া কাগজ পুরাইবার চেষ্টা করিবেন।"

ষড়ানন্দের সূক্ষ্ম দেহ—যেহেতু ষড়ানন্দ ইদানীং F. T S সুতরাং তাহার লিঙ্গ শরীর—বুঝিল যে, দেশটার সকলই বিচিত্র এবং এইরূপ দেশই মেস্‌মেরিজম্-মহামন্ত্রসাধনের অতি উপযোগী ও প্রশস্ত ক্ষেত্র!

ইতি শ্রীষড়ানন্দকৃত রোজনামচা নামক মহাপুরাণে ইল্‌বার্টবিলপর্ব্বে কতিপয় অধ্যায়।

স্বস্তিঃ শ্রীষড়ানন্দ শর্ম্মা, স্মৃতি বিনোদ ভট্টাচার্য্য (নবদ্বীপ ও বিদ্যপুষ্করিণী) তথা M. A., B. L. ও Y. A., C. L. (কলিকাতা ও পঞ্জাব ইয়ুনিভার্সিটী)

সতী দাহ।

সতী-দাহ-প্রথা কি কারণে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল তাহার হৃদয়গ্রাহী যুক্তি কিছুই পাওয়া যায় না। ইহা যে আদৌ শুভকরী ছিল না তৎপক্ষে এক্ষণ আর মত ভেদ হওয়া সম্ভাবিত নহে।

ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবসমুদায়ের মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বপ্রধান। অপরাপর জীবাপেক্ষা উচ্চতর গুণসমূহে মণ্ডিত বলিয়াই যে জীবমধ্যে মনুষ্য এই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, ইহা সহজেই প্রতীত হয়। এই পঞ্চভূতাত্মক-দেহসম্ভূত বাহ্যজগতের কার্য্যোপযোগী গুণসমূহ ব্যতীত মনুষ্য বহির্জগতাবচ্ছিন্ন অধ্যাত্মজগতেরও কার্য্য করণে সমর্থ। অধ্যাত্মজগতোপযোগী কার্য্যনিচয় অন্তশ্চক্ষুঃ ব্যতীত বাহ্যেন্দ্রিয়ের গোচর নহে। সুতরাং বাহ্যবস্তুর সহিত তাহাদিগের সমন্বয় সাধন করা অতীব দুরূহ। যাহা বাহ্যপ্রকৃতির সহিত এবং দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের সহিত সংমিলিত না হয় তাহা পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের অনুমোদিত নহে, এবং সেই সকল কার্য্যকে তাঁহারা বাতুলতা বিবেচনায় উপেক্ষা করিয়া থাকেন। সুতরাং কর্ম্মী ও দৃঢ়বিশ্বাসী ব্যতীত অপর কেহ অধ্যাত্মজগতের কার্য্যনিচয় সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। জন্মান্ধ যেরূপ সূর্য্যের আকার গঠন বা জ্যোতি অনুভব করিতে অক্ষম, বধির যেরূপ গীতবাদ্যের শ্রুতিসুখকর তানলয়ের মধুরতা আস্বাদনে অসমর্থ, শিক্ষানভিজ্ঞ শিশু যেরূপ ক্রিয়ার ফলবিষ উপলব্ধি করিতে অপারক, নিরবচ্ছিন্ন বহির্জগৎবিচরণকারী এবং অন্তর্দৃষ্টিবিরহিত ব্যক্তির পক্ষে অধ্যাত্মজগতের কার্য্যপ্রণালী সেইরূপ কল্পনাতীত। ফলতঃ এই উভয় জগতের মার্গ সম্পূর্ণ পৃথক্।

ভারতবাসী আর্য্যঋষিগণ যে অধ্যাত্মজগতে বিচরণ করিয়া ভারতের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা চেষ্টা দ্বারা সংসাধিত করা এখনও নিতান্ত অসম্ভব নহে। যখন মনুষ্য এই বহির্জগতের কার্য্যকলাপ ব্যতীত অধ্যাত্মজগতেরও কার্য্য করণে সমর্থ, তখন বহির্জাগতিক লীলাখেলার সঙ্গেই তাহার সকল কার্য্যের শেষ হইল না, অধ্যাত্মকার্য্যের প্রতি অন্তশ্চক্ষুঃ সংযোগ করাও তাহার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। অতএব স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, ইহসংসারে আসিয়া কেবল ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করাই মনুষ্যের কার্য্য নহে; তদপেক্ষা মহান্ ও গুরুতর কার্য্য তাহার জন্য নিয়োজিত রহিয়াছে এবং তাহা সম্পন্ন করিতে পারে বলিয়াই অপরাপর প্রাণীর উপর মনুষ্যের প্রাধান্য।

সচরাচর যেরূপ দেখা যায়, নিরবচ্ছিন্ন ঐহিক সুখ চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই নর ও নারী পতিপত্নীভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকে; আধ্যাত্মিক কার্য্যে তাহাদের পরস্পর সাহচর্য্য লক্ষিত হয় না। এরূপ অবস্থায় পতির বিয়োগে পত্নীর সহমরণ সঙ্গত ও ঈশ্বরাভিপ্রেত কি না ভাবিয়া দেখা উচিত। একের জন্য অপর প্রাণপরিত্যাগ করিবে ইহাতে বোধ হয় যে, হিন্দুসমাজের রীত্যনুসারে

পতির অবর্ত্তমানে সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখ বিসর্জ্জন দিয়া কঠোর ব্রতাচরণপূর্ব্বক দেহকে কষ্ট প্রদান করা পত্নীর অভিপ্রেত নহে। যে পতির সহিত সমুদায় পারিবারিক সুখ বিসর্জ্জিত হইতেছে তাহার সহিত শ্মশান-সৈকতে চিতাশয্যায় শয়ান হইয়া এই পাঞ্চভৌতিক দেহের ভস্মাবশেষ করাই তাহার পক্ষে বিধেয়। কিন্তু একি আশ্চর্য্য রীতি! জঘন্য ইন্দ্রিয়সুখ বিনষ্ট হইল বলিয়াই কি দেহের অপর কোন প্রয়োজন নাই, এবং তজ্জন্য তাহার বিনাশ সাধন করা কি ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত? জ্ঞানবিভূষিত মনুষ্যের পক্ষে ইহা কখনই অনুমোদনযোগ্য বোধ হয় না। যে পত্নী এই ভাবে আপন দেহের বিনাশ সাধন করিতে পারে, সামান্য কারণে আত্মঘাতিনী হওয়া তাহার পক্ষে বিচিত্র নহে। যিনি আত্মহননে কুণ্ঠিতা নহেন, তিনি সময়ে অন্যের প্রাণও অনায়াসে বিনাশ করিতে পারেন।

শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, পতিবিয়োগে পত্নী সমুদায় সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রহ্মচারিণী হইবে এবং তৎসহকারে ব্রহ্মচর্য্যোপযোগী ব্রতনিয়মাদি পালন করতঃ জীবনাবশিষ্ট সময় ধর্ম্মোপার্জ্জনে ক্ষেপণ করিবে। সংসারে আবদ্ধ হইয়া সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করতঃ জীবন যাপন করিবে বলিয়াই স্ত্রীপুরুষের মধ্যে উদ্বাহপ্রথার সৃষ্টি এবং তজ্জনিত সম্বন্ধ চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে বলিয়াই সেই উদ্বাহকার্য্য ধর্ম্মসাক্ষ্য করিয়া সম্পন্ন হয়। এরূপ ধর্ম্মানুমোদিত বিবাহ দ্বারা কামিনী যখন একবার একমাত্র পুরুষে নিজ প্রাণমন সমর্পণ করিল, ঐহিক সুখদুঃখের ভার চিরদিনের জন্য তাহার উপর বিন্যস্ত করিল, তখন দৈবগতিকে সেই স্বামীর অকালমৃত্যুতে আবার সেই প্রদত্ত প্রাণমন অপরে সমর্পণ করা ঈশ্বরাভিপ্রেত নহে। এই বিবেচনায় তাঁহার পক্ষে এই অনিত্য জগতের সুখসমুদায় পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সুখ ও শান্তির আধার অচিন্ত্য ও অব্যক্ত পরমাত্মার উপাসনায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করা এবং তজ্জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করার বিধি। স্ত্রীবিয়োগে স্বামীর পক্ষেও এইরূপ কোন বিধান থাকা উচিত ছিল, কিন্তু সে বিষয় আমাদিগের এ প্রস্তাবের আলোচ্য নহে।

মুসলমান-শাসনের অভ্যুত্থান সময় হইতে অস্মদ্দেশে শাস্ত্রালোচনা ক্রমশঃ বিরল হইয়া পড়ে। জ্ঞানবিরহিত লোকসকল আপন আপন কার্য্যকে অবশ্য জ্ঞান করিত ও আপন আপন যুক্তি স্থিরমীমাংসা বলিয়া তাহাদিগের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল; সুতরাং তৎকালে নানা মুনির নানা মত ও নানা বিধান বিধিবদ্ধ হইতে লাগিল। পুরাকালিক মনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষগণ স্বামিবিয়োগে সাধ্বীস্ত্রীর যে কর্ত্তব্য স্থির ও সহমরণের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, অপরিণামদর্শী স্থূলবুদ্ধি এই সমস্ত লোকের হস্তে তাহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে লাগিল ও প্রকৃত অর্থ ক্রমশঃ সাধারণের অজ্ঞাত হইয়া পড়িল। পতিবিয়োগে পত্নীর একাদশী, একাহার প্রভৃতি কঠোর ব্রতধারণের দ্বারা কষ্ট ভোগ করা অপেক্ষা মৃতপতির সহিত এক চিতায় শয়ান হইয়া দেহ ভস্মীভূত করাই তাঁহাদিগের মতানুমোদিত হইল। এই কারণেই অনর্থকরী সহমরণপ্রথার সৃষ্টি। সৌভাগ্যক্রমে অনতিকাল মধ্যেই বঙ্গের শিরোভূষণ মহাত্মা রামমোহন রায়ের যত্নে ও পরদুঃখকাতর

উন্নতমনা রাজপ্রতিনিধি মহামতি বেণ্টিঙ্কের অনুগ্রহে ঐ প্রথার সমূলোচ্ছেদ হয়।

পুরাকালিক পণ্ডিতেরা, সম্ভবতঃ, কি অর্থে 'সহমরণ' বা 'সতীদাহ' গ্রহণ করিতেন, আমরা এ স্থলে তাহাই সংক্ষেপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

পতিবিয়োগে পত্নী তৎসহ আপন পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, পুরাকালিক পণ্ডিতেরা, বোধ হয়, কখনই এরূপ বিধান করেন নাই। ঐহিক সূত্রে বদ্ধ কোন জীবের নিমিত্ত অন্যে আপন প্রাণ বিনাশ করিবে সুতরাং তদ্দ্বারা সৃষ্টি বৃদ্ধি ভিন্ন ক্রমশঃ লোপ ঘটাইবে, এইরূপ নৃশংস আচরণে তাঁহারা কখনই মত দেন নাই।

অগ্নির মাদৃশ দাহিকাশক্তি আছে এবং মনুষ্যমাত্র যদ্দ্বারা যদ্রূপ দগ্ধ হয়, তদ্রূপ দহনগুণসম্পন্ন অগ্নি সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। এই চন্দ্রাবৃতপৃথিবীমধ্যে অগ্নি প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, অগ্নির অভাবে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হয় না, মনের কার্য্য সম্পন্ন হয় না, ইন্দ্রিয় নাড়িত্রয় প্রবহমান কার্য্য করণে সমর্থ হয় না,—প্রত্যুত অগ্নির অভাবে সংসারের কোন কার্য্যই সাধিত হয় না, অগ্নির অভাবে মনুষ্যকে জড় প্রায় বলিলেও বলা যায়। অতএব অগ্নি যেরূপ বস্তুনাশক, পক্ষান্তরে উহা সেইরূপ বস্তু-উৎপাদক, ইহা যেরূপ স্থূলদ্রব্যের নাশ করে, তদ্রূপ আবশ্যকীয় অন্য সূক্ষ্মপদার্থের উৎপাদনও করে।

মানবজীব কর্ম্মের বন্ধনী এবং কর্ম্মই তাহার মোচনের উপায়, কর্ম্মই জীবের উৎপত্তির মূল এবং কালে সেই কর্ম্মই তাহাকে জীবপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। কার্য্যের তারতম্যানুসারে জীবের গতি হইয়া থাকে, তজ্জন্যই শাস্ত্রকারেরা পুনঃ পুনঃ কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন এবং তজ্জন্যই সকল কার্য্যে "এতৎকর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু" বলিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে অনুভূত হইবে যে, মানব সংসাররূপ নাট্যশালার নট, কেবল রূপপরিবর্ত্তন করিয়া সময়ে সময়ে আগমন করতঃ কৌতুক দেখাইয়া যাইতেছে, এবং সাংসারিক সুখ ও দুঃখ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল স্বপ্নের ছায়াবৎ। এখন সতীকে পতিবিয়োগে ভাবিতে হইবে যে, এই স্বপ্নবৎ ক্ষণিক ঐহিকসুখের পশ্চাৎ মর্ম্মভেদিকার ধায় ধাবিত না হইয়া আপনার জীবনের প্রকৃত কার্য্য করাই তাহার পক্ষে বিধেয়। মনুষ্য মাত্রেরই যখন ব্রহ্মচর্য্যানুব্রত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন পতিবিয়োগ-বিধুরা সতীর পক্ষেও সেই পথ অবলম্বন করা ঈশ্বরাভিপ্রেত। অতএব তিনি পতিবিয়োগের সহিত সমুদায় বৈষয়িক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠোপযোগী ব্রতনিচয় ধারণ করতঃ জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অধ্যাত্ম চিন্তায় যাপন করিবেন। এই আধ্যাত্মিক কার্য্যের দ্বারা তাঁহার ভৌতিক জীবনের ক্রমশঃ মুক্তি ঘটিবে। অর্থাৎ বহির্জগৎ বিচ্ছিন্ন অন্তরাগ্নির দ্বারা স্থূলদ্রব্য ধ্বংশীকৃত হইয়া সূক্ষ্মদ্রব্য উৎপাদিত হইবে। বর্ত্তমান কালে পতিবিয়োগে বিধবার জন্য একাদশী-ব্রত, একাহার, নিরামিষভোজন প্রভৃতি যে সমস্ত নিয়ম দৃষ্ট হয়, ইহা সেই ব্রহ্মনিষ্ঠার পথপ্রদর্শক বিধান। সতী কর্ম্মাগ্নি দ্বারা নিজ অশুভকার্য্য দহন (নাশ) করতঃ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা আত্মাশোধন করিবেন। সীতা যেমন স্বামিসমক্ষে জ্বলন্তাগ্নিতে প্রবেশ করিয়া নিজ পবিত্রতা দেখাইয়াছিলেন,

সাধ্বী সতী স্বামিবিয়োগের সঙ্গে সেইরূপ কঠোর ব্রতাদিরূপ কর্ম্মাগ্নি দ্বারা বাহ্যিক অশুভ কর্ম্মসকল এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা অন্তরাত্মার মালিন্য দগ্ধ করিয়া শুদ্ধচৈতন্যে আত্মসংযোগ করিবেন। ইহাই প্রকৃত "সতীদাহ" বা "সহমরণ"। চিতার উপর পতিসহ পার্থিব স্থূলদেহদহন করা সতীদাহ নহে। এই সতীদাহের চিতা—কর্ম্মাগ্নিময় নিক্ষপুরী, ইহার ইন্ধন—ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত, ইহার দাহ্যবস্তু—নিজকৃত অশুভকর্ম্ম ও আত্মার মালিন্য, এবং ইহার চরমফল—আত্মা ও পরমাত্মার সামীপ্য ও সংযোগ।

শ্রীঅঃ—

কাল।

চলি গেল কাল :—
চিরকাল ধরে
কালের অন্তরে
কাল মিশাইয়া গেল।
এ কাল, সে কাল,
—কত কাল এই ভাবে
কালের অতল গর্ভে মিশাইয়া যাবে।

কভু নিদাঘের প্রচণ্ড তপন,
কভু বর্ষার বারিবরিষণ,
কভু বা শরতে
পূর্ণিমাসী শশী,
নীল নৈশাকাশে
আধ আধ মিশি',
অধরে মধুর
আধ আধ হাসি,'
কুমুদিনী সনে করে আলাপন।

হিমে বসুন্ধরা
হৈমলতা সনে
নীল, পীত, আধ হরিত বরণে
জড়াজড়ি করি,'
এধারি, ওধারি,
ধীরি ধীরি
কভু করে বা খেলা।
কভু শীত ভরে
জড়সড় প্রাণ
কাঁপে হিয়া দুরু দুরু
সঘন কাঁপন,
একায় সেকায়
করি, বা না করি,
চলিয়ে যায় শীতের বেলা।

কভু বা বসন্তে বসন্ত সেনা
বসিয়া তমাল-ডালে,
পঞ্চমে চড়া'য়ে
তালে তালে তালে
কুহু-কুহু তান
করি' কল গান
জ্বালায় বিরহি প্রাণের জ্বালা ;—
ফুল্ল কুসুমে ব্যাকুল অলি
ধীরি ধীরি ফিরি'
এ কলি সে কলি
মধুর গুঞ্জনে যুড়ায় কাল ,—
চূত-লতিকা-গায়
দূর-মলয় বায়
মৃদু মন্দ মধুর যায়
মধু রাশি কভু ছড়া'য়ে যায়।

এইরূপ কত কাল,
নাহি মানি' কালাকাল,
অনন্ত কালের স্রোতে
ভাসিয়া যায়।—
তুমি, আমি, এ, সে,
থাকি, যাই,—আসে, বসে,
'তুমি কা'র?
কে তোমার?'
আমি কা'র?
কে আমার?
কার' মুখপানে
কাল কি কভু হারা'য়ে বসে?

দু'দিনের তরে
প্রকৃতির কোলে
এস সবে মিলি,
করি' কোলাকুলি।
ইহ-কাল খেলা খেলিয়া লই।
—কালের পীড়নে
সব হ'বে ছাই,
স্মৃতি-চিহ্ন ছাড়া র'বে না কিছুই,
ছাড়ি' যা'বে মায়া,
পড়ি' র'বে কায়া,
তুমিও সে, আমিও সে,
ছোট বড় কেবা কে?
কালের কটাক্ষে কভু ছোট বড় নই।

শ্রীশ্যাঃ।

যোগ রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

দীর্ঘজীবন, অনাহার, ও কুম্ভক শিক্ষা।—যোগিগণ প্রকৃতিপুস্তক পাঠ করিতে করিতে আরও দেখিলেন যে, যদি আমরা উপায়ক্রমে ভেক, কচ্ছপ, ও সর্পাদি জাতির স্বভাব অনুকরণ করিতে পারি ত অবশ্যই দীর্ঘজীবী হইতে পারিব, এবং দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিলেও আমাদের দেহবিয়োগ হইবে না।

"নাশ্নন্তি দর্দুরাঃ শীতে ফণিনঃ পবনাশনাঃ।
কূর্ম্মাশ্চ স্বাঙ্গগোপ্তারো দৃষ্টান্তা যোগিনো মতা॥"

ঐ সকল জীব শীতকালে মৃত্তিকাবিবর ও গিরি গহ্বরাদি আশ্রয় করিয়া অনাহারে জড়বৎ কালযাপন করে। বিশেষতঃ শীতকালে ভেকজাতির দেহ প্রায় মৃত্তিকাতুল্য হইয়া যায়। তৎকালে তাহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কি অন্য কোনরূপ চেতনকার্য্য বর্ত্তমান থাকে না। পরন্তু বর্ষার প্রারম্ভ হইলে পুনশ্চ তাহারা নবজীবন প্রাপ্ত হয়। তখন তাহারা আহারবিহারাদি জৈবিক কার্য্য করিতে থাকে। যে যোগী কৌশলক্রমে ঐ সকল জীবের স্বভাব অনুকরণ বা অভ্যাস করিতে পারেন, তিনি সহজেই সমাহিত হইতে পারেন, এবং অনাহারেও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারেন। তৎকালের অনাহার তাহার কিছুমাত্র ক্ষতি করিতে পারে না। কেন না যোগীর সমাধি আর উল্লিখিত প্রাণিনিচয়ের শীতনিদ্রা প্রায় সমান।

যোগীরা যে প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করেন, তাহা তাঁহারা উল্লিখিত প্রাণিসমূহের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা

অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সকল প্রাণীর শ্বাস-সংখ্যা অল্প ও অল্পায়ত,—সেই সকল প্রাণীরাই দীর্ঘজীবী। আর যাহাদের শ্বাসসংখ্যা কিছু অধিক ও দীর্ঘ, তাহারা অল্পায়ু অর্থাৎ তাহারা অল্পকাল জীবিত থাকে। ইহা দেখিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন যে, মনুষ্য যদি আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসকে অল্পায়ত ও অল্পসংখ্যক করিতে পারে ত অবশ্যই তাহারা আপন নির্দ্দিষ্ট জীবন-কাল অপেক্ষা অধিককাল জীবিত থাকিতে পারে। আর শ্বাস-সংখ্যার ও শ্বাস আয়তনের অল্পতাপ্রযুক্তই যে দীর্ঘজীবী হয়,—স্বরোদয়যোগে তাহার কার্য্যকারণভাব বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। সে বিচার উঠাইয়া এস্থানে প্রস্তাবের অবয়ব বৃদ্ধি করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। সুতরাং এস্থলে একটী তদনুযায়ী ক্ষুদ্র তালিকামাত্র প্রদান করিলাম।

প্রাণী	প্রাযিক-শ্বাস সংখ্যা	প্রাযিক পরমায়ু
শশ	২৮।২৯	৮ বৎসর
কপোত	৩৩।৩৭	৮।৯ „
বানর	৩১।৩২	১০।১১ „
কুক্কুর	২৮।২৯	১৩।১৫ „
ছাগল	২৪।২৩	১২।১৩ „
বিড়াল	২৪।২৫	১২।১৩ „
ঘোড়া	১৮।১৯	৫০।৪৮ „
মনুষ্য *	১২।১৩	১০০ „
হস্তী	১১।১২	১০০ বৎসর
সর্প	৭।৮	১২০।২২ „
কচ্ছপ	৪।৫	১৫০।৫৫ „

এ সম্বন্ধে কয়েকটী খনার বচন আছে। তাহার একটী এই—

"নবা গজা বিশে শয
তার অর্দ্ধেক ঘোড়া বয।
বাইশ বল দা তের ছাগলা
গুণে পড়ে বরা পাগলা॥"

কেহ কেহ বলেন, "ভেবে ভেবে বরা পাগলা", এইরূপ পাঠই সঙ্গত। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বরাহ সকল ছাগল অপেক্ষাও অল্পজীবী। বস্তুতঃ অনেক বৃহৎকায় পশু সর্ব্বদাই ধুঁকিতে থাকে। তন্নিবন্ধন তাহাদের রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়ার আধিক্যহেতু দৈহিকগঠন দৃঢ় ও বলাধিক্য থাকিলেও তাহাদের আয়ুষ্কাল অতি সংক্ষিপ্ত। ছাগ, গো, মেষ ও মহিষ প্রভৃতি পশুর যৌবনকালে শ্বাসপ্রশ্বাসের আধিক্য ও আয়তন বৃদ্ধি হয়। সেই জন্যই তাহারা দীর্ঘকাল জীবিত থাকে না। আয়ুঃক্ষয়কারী ও আয়ুর্বৃদ্ধিকারী কারণাস্তর বর্ত্তমান থাকিলে উল্লি-

* পূর্ব্বে যখন লোক সকল সবলকায়, অরোগী ও শতাধিক বৎসর জীবিত থাকিত, তখনকার শ্বাস-সংখ্যার সহিত এখনকার মনুষ্যের শ্বাস-সংখ্যার ঐক্য হয় না। তখনকার মনুষ্যের শ্বাস-সংখ্যা প্রায় ১১।১২ই ছিল, কিন্তু এখনকার মনুষ্যের আয়ুর অল্পতা প্রভৃতি দোষে তাহাদের শ্বাস সংখ্যা প্রায় প্রতি মিনিটে ১৫।১৬ সংখ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রকারেরা কলির মনুষ্যের শ্বাসসংখ্যা গণনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,—"ষষ্টি শ্বাসৈর্ভবেৎ প্রাণঃ ষট্‌প্রাণা নাড়িকা মতা। ষষ্টিনাড্যা অহোরাত্রং জপসংখ্যাক্রমোমতঃ॥ একবিংশতিসাহস্রং ষট্‌শতাধিকমীশ্বরি। জপতে প্রত্যহং প্রাণী"—ইত্যাদি। ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, মনুষ্যজীব এক অহোরাত্রে একুশ হাজার ছয় শ বার হংসমন্ত্র জপ করে—অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাহ করে। সুতরাং জানা গেল যে, কলির মনুষ্যেরা প্রতিমিনিটে ১৫ বার মাত্র শ্বাস-প্রশ্বাস বহন করে।

খিত নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াও থাকে। যোগিগণ সেই জন্যই উল্লিখিত জীব নিবহের শ্বাস-প্রশ্বাস আদর্শ করিয়া প্রথমতঃ প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া থাকেন। পরন্তু সেই প্রাণায়াম কার্য্যটী নিতান্ত বিঘ্নপরিশূন্য নহে। উহা যদি সুনিয়মে শিক্ষা করা না হয় ত উহা হইতে বিবিধ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। ফুসফুসের স্ফীতি নিবন্ধন শ্বাস, কাশ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মস্তিষ্ক-বিকার ও বিবিধ বায়ুরোগ জন্মিতে পারে। ক্ষুধামান্দ্য, আহারে অরুচি, কোষ্ঠবদ্ধতা ও কায়িক পরিশ্রমে উদ্যমহীনতা প্রভৃতি দোষ প্রায়শঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সাধনের ব্যতিক্রম হইলেই রোগ জন্মিবে,—ইহা শুনিয়া ভয় পাওয়া উচিত নহে। কেন না, ভোগজ উপসর্গের ন্যায় যোগজ উপসর্গেরও শান্তি হইয়া থাকে। "ভোগে রোগভয়ম্", ভোগে রোগ ভয় আছে। কুষ্ঠিনীসুন্দরীসম্ভোগ করিতে গেলে রোগ হইবে, ইহা ভাবিয়া কে কোথায় ভোগ-বিমুখ হইয়াছে? তদ্রূপ, যোগীরাও যোগানুষ্ঠানের ব্যতিক্রম হইলে রোগ হইবে, ইহা ভাবিয়া যোগবিমুখ হন না। তাঁহাদের মনোভাব এই যে, রোগ হয় হইবে, তথাপি যোগ ছাড়িব না। রোগ হয় চিকিৎসা করিব। চিকিৎসার দ্বারা তাহার শান্তিবিধান করিব। আমাদের ভোগজব্যাধিসকল বৈদ্যের নিকট যত দুরপনেয় বা দুঃসাধ্য—যোগীর নিকট যোগজব্যাধি তত দুরপনেয় বা তত দুঃসাধ্য নহে। যোগীর নিকট যোগজ উপসর্গ (রোগ) সকল অতি যৎসামান্য ও তুচ্ছ বটে, পরন্তু তাহা বৈদ্যের নিকট তুচ্ছ নহে। বৈদ্যেরা কেবল ভোগিদিগের ভোগজ ব্যাধির শান্তিবিধান করিতে পারেন, যোগিদিগের যোগজ উপসর্গের কিছুমাত্র করিতে পারেন না। যোগিদিগের চিকিৎসা এক স্বতন্ত্র কাণ্ড। আমরা প্রস্তাবান্তরে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের কুতূহল চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিব। এক্ষণে প্রসঙ্গাগত কথা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাউক।

প্রাণায়াম সাধন করিতে করিতে যোগী যখন তাহার উচ্চপ্রান্তে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার এক কিংবা দুই প্রস্থতি নিতল দুগ্ধ হইলেই যথেষ্ট হয়। তখন তিনি উক্ত পরিমাণের অধিক আহার করিতে পারেন না। করিলেও তাহা পরিপাকপ্রাপ্ত হয় না। তৎকালের উপযুক্ত দ্রব্য ব্যতীত অনুপযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিলেও তাহা তাহাদের পীড়াকর হয়। তৎকালের অর্থাৎ যোগ সাধন-কালের উপযুক্ত আহারীয় দ্রব্য কি? তাহা এই প্রস্তাবের বক্তব্য নহে। কোন্ দ্রব্য কিরূপ করিয়া কি পরিমাণে ভোজন করিলে তৎকালের উপযুক্ত হইবে, অর্থাৎ পীড়াকর হইবে না সে সমস্তই যোগ-শাস্ত্রে লিখিত আছে, এবং সে সমস্তই স্বতন্ত্র প্রস্তাবে বলিবার ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে যাহা চলিতেছে তাহাই চলুক।

আহারপরিমাণ সঙ্কুচিত হইলে দেহ প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ক্লিষ্ট ও ক্ষীণ হয় বটে; পরন্তু তৎসঙ্গে ইন্দ্রিয়সংযম থাকায় পরিণামে সেই ক্ষীণদেহেই এক আশ্চর্য্য কান্তি প্রাদুর্ভূত হয়। তাঁহার শরীর তখন রুগ্ন নহে অথচ অধিক বলশালীও নহে, এরূপ মধ্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যদিও কাহারও কাহারও অধঃকায় কিছু কৃশ, কান্তিহীন ও শিরাব্যাপ্ত হয় বটে, পরন্তু তাঁহার মুখমণ্ডলে এমন এক অনির্ব্বাচ্য শ্রী ও জ্যোতিঃ আবির্ভূত হয় যে,

সে জ্যোতিব বা সে শ্রীব সাদৃশ্য আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ তদীয় দৃষ্টি বা নেত্র-জ্যোতিঃ অতীব মহিমান্বিত হয়।

"যোগীকো ভোগীকো রোগীকো জান্,
আঁকমে নিশান্, আওর্ আঁকসে পছান্।"

[জান্—হৃদয় বা অন্তঃকরণ। নিশান্—চিহ্ন। পছান্—পরিচয় পাওয়া।]

বস্তুতঃ অপরিচিত লোকের চোক্‌মুখের ভাবভঙ্গী দেখিয়া তিনি যোগী কি ভোগী কি রোগী তাহা বিলক্ষণ অনুমান করা যায়।

পূর্ব্বকালে এক ঋষি একদা এক শিষ্যের প্রতি অগ্নিসেবার ভার অর্পণ করিয়া প্রবাস-গমন করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে অগ্নি-দেবতা তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিলেন। অনন্তর ঋষি গৃহাগত হইয়া দেখিলেন, শিষ্যের মুখকান্তিতে ও নেত্র-জ্যোতিতে আর পূর্ব্বের ন্যায় অজ্ঞানভাব নাই। তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথং সৌম্য। ব্রহ্মবিদিব ভাসতে তে মুখম্?" বৎস! তোমার মুখ আজ্ ব্রহ্মজ্ঞদিগের মুখের ন্যায় উদ্ভাসিত দেখিতেছি কেন?

ঋষি যেমন শিষ্যের মুখ দেখিবামাত্র তাহার ব্রহ্মজ্ঞতা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, সেইরূপ, সকল ব্যক্তিই নৈপুণ্যসহকারে লোকের চোক্ মুখ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, সে ব্যক্তি যোগী, কি ভোগী, কি রোগী,—তাহা বুঝিতে পারেন। হিন্দুস্থানী পণ্ডিতের ন্যায় এক জন ইংরাজপণ্ডিতও বলিয়াছেন, "A Face is an index of a man's character" বস্তুতঃ চোক্‌মুখই পর-মনোবৃত্তি বুঝিবার আদর্শ। কেন না, মনুষ্যের অন্তঃকরণ ও তাহার ইচ্ছাশক্তি সকল চিৎ-প্রতিবিম্বিত হইয়া সদাসর্ব্বদাই নেত্রপথে বহির্বাগত হইতেছে *। লোকের মনোভাব-সকল চাক্ষুষ আলোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া নেত্ররশ্মির যোগে বহির্বাগত হয় বলিয়াই মুখ-মণ্ডলে বিবিধ বিকার প্রাদুর্ভূত হয়। সেই জন্যই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা লোকের চোক্ মুখ দেখিয়া তাহাদের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন, কিন্তু অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা পারে না। যে অভিজ্ঞ অথবা যে মহাত্মা নিসর্গের উক্ত অদ্ভুত প্রভাব বুঝিতে পারেন, অবশ্যই তিনি তদ্বিষয়ক নূতন শিল্প উদ্ভাবন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। সেই নূতন শিল্পের দ্বারা তিনি না করিতে পারেন এমন কার্য্যই নাই। তিনি সেই দৃষ্টিবিজ্ঞান বা চাক্ষুষী-বিদ্যার দ্বারা † মনুষ্যকে পাগল করিয়া তুলিতে পারেন, মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন, ইন্দ্রজাল বা বিবিধ ভোজবাজী (ভেল্কী) দেখাইতে পারেন, অন্যের আত্মায় ও অন্যের অন্তঃকরণে আপনার আত্মাকেও আপনার ইচ্ছাশক্তিকে আবিষ্ট করিতে পারেন,—তাহার আত্মাকে আকর্ষণ, বিকর্ষণ, ও অভি-ভূতকরণ প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। পূর্ব্বে অজ্ঞ লোকেরা এই চাক্ষুষী-বিদ্যাকে ছিটা মন্ত্র, ডাইনের মন্ত্র ও কামরূপ কামাখ্যার আজ্ঞা বলিয়া জানিত। পূর্ব্বে কামরূপবাসিনী রমণীরা নাকি এই চাক্ষুষী-বিদ্যার যৎকিঞ্চিৎ মহিমা জ্ঞাত ছিল, তাই তাহারা নির্বোধপুরুষদিগকে ভেড়া বনাইয়া

* "চক্ষুর্জনমনোবৃত্তি-শিচ্ছাক্তা রূপভাসিকা।
দৃষ্টিরিত্যুচ্যতে তজ্জ্ঞৈঃ সৈব লিঙ্গং তদাত্মনঃ॥"
তদাত্মনঃ তস্য জনস্য আত্মনঃ স্বভাবস্য অন্তঃকরণস্য বা লিঙ্গং গময়তি।

† "চাক্ষুষী নাম বিদ্যেয়ং যাং সৌম্যায় পুরা মনুঃ
প্রদৌ স বিধিবদদে সর্ব্ব বিদ্যাবিদুর্দ্ধৌ॥

বাখিত। এখনকাব বারাঙ্গনারা ত কোন বিদ্যাই জানেন না, তথাপি তাঁহাবা সম্মুখে আদর্শ বা আযনা বাখিযা মনোমুগ্ধকাবী দৃষ্টি বা চাহনি, হাঁসি, ভ্রূভঙ্গী প্রভৃতি শিক্ষা কবেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, 'আমবা লোককে "আইস" বলিযা ডাকিব না, অথচ লোকসকল মুগ্ধ হইয়া আপনা আপনিই আমাদেব নিকট আসিবে।' অনেক ফকীব, অনেক দববেশী, অনেক বাউল, অনেক নেড়াবৈষ্ণব, অনেক নানকপন্থী ও অনেক সন্ন্যাসীবাও চাক্ষুষীবিদ্যা কি ?—তাহা জানেন না। তথাপি তাঁহারা উহাব যৎকিঞ্চিৎ প্রতিচ্ছাযা শিক্ষা করিতে ত্রুটী করেন না। বস্তুতঃ মনেব ভাব, মনেব ইচ্ছা, মনেব নেশা বা মনেব আসক্তি চক্ষে আনিতে না পাবিলে, কোন ক্রমেই লোককে আত্মমতে আকর্ষণ কবা যায না। লোকসংগ্রহ কবাও যায না। যে সাধক বা ধর্ম্মাচার্য্য আপনার অন্তবেব ইচ্ছাকে বা ধর্ম্মেব নেশাকে চক্ষে আনিতে পাবেন, সেই সাধকই লোককে আত্মমতে আকর্ষণ কবিতে পাবেন, অন্যে পারেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীবব বেদান্তবাগীশ।

সার-সংগ্রহ।

মাসিক পত্র।

ভাবতী—মাঘ, ১২৯০। ৭ম ভাগ—১০ম সংখ্যা।

১। বামাযণ। কালেব সহিত ভাষার ও লৌকিক আচার ব্যবহাবেব বিস্তব পবিবর্ত্তন হওযাতে পুবাতন গ্রন্থ সকল পাঠ করিযা পরিষ্কার তাৎপর্য্য গ্রহণ কবিতে পারা যায না। যাহাতে রামাযণেব নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার হয়,—ইহার অপরিস্ফুট অংশগুলি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায়, ইহা পাঠ করিবাব সময় ইহাতে বর্ণিত বিষয়সকলেব জীবন্ত চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত হয় ইত্যাদি অসুবিধা যাহাতে নিবারিত হইতে পারে—তাহা প্রবর্ত্তন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। অযোধ্যানগর সুবিভক্ত ছিল, তথায় সকল যন্ত্রাযুধ ছিল, অযোধ্যানগরী শতঘ্নীশত-সঙ্কুলা ছিল, পুরী বধূনাটক সংযুক্ত ছিল—ইত্যাদি স্থলে "সুবিভক্ত" "যন্ত্রাযুধ" "শতঘ্নী" "বধূনাটক" ইত্যাদি শব্দে কি বুঝাইতেছে তদ্বিষযে বিচার কবা হইয়াছে।

২। কৃষি। (শ্রীঃ)। অনেকেই বলেন, ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্যের বড় দুরবস্থা, তজ্জন্য বিলাতী যন্ত্রাদির দ্বারা বৈজ্ঞানিক মতে ভূমিকর্ষণ শিক্ষা আবশ্যক। লেখক বলেন, পূর্ণকৃষক ভারতবর্ষের আবার কৃষিশিক্ষা কি ? বিলাতী যন্ত্রাদি এদেশের উপযোগী নহে এবং যন্ত্রাদিরদ্বারা শ্রমের হ্রাসকরা অপ্রয়োজনীয। আমাদিগকে ইংরাজ কৃষিকার্য্য শিখাইতে যেমন যত্নবান, যন্ত্রাদির ব্যবহারাদি শিখাইতে তেমন নহে ; তাহার কারণ এই যে, আমাদি-

গের কৃষিজাত দ্রব্যাদি বর্দ্ধিত হইয়া রপ্তানী হইলে ইংলণ্ডেরই লাভ। অতএব কৃষি ছাড়িয়া যাহাতে কলের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় আমাদিগের তাহারই চেষ্টা করা আবশ্যক।

৩। ব্যাঙ্কিং। (শ্রীফনিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বি, এস, সি)—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। ব্যাঙ্কের চারি প্রকার কার্য,—টাকা গচ্ছিত রাখা, যাহারা টাকা গচ্ছিত রাখে তাহাদিগের আদেশ মত ঐ টাকা অন্য লোককে দেওয়া, টাকা ধার দেওয়া, এবং নোট ছাপান;—তাহাদিগের কার্য্যপ্রণালী এবং ইংলণ্ডে যে সব ব্যাঙ্ক আছে তাহাদিগের পরস্পরের ও ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের সহিত কি সম্বন্ধ, এই সকল বিষয় বিবৃত হইয়াছে। আমাদিগের দেশে ব্যাঙ্কের দ্বারা কি উপকার হইতে পারে তাহারও উল্লেখ আছে।

৪। যোগতত্ত্ব। (শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ)—পূর্ব্বের অনুবৃত্তি। কর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা ত্রিপ্রকার এবং কাহার কি প্রকার কর্ম্ম তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বেদান্তবাগীশমহাশয় কর্ম্মের ভবিষ্যৎ পরিণাম অর্থাৎ ফলোৎপাদকতা বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মবাসনা বা কর্ম্মসংস্কার ইহজন্মে অভিব্যক্ত হইলে তাহা প্রবৃত্তি বা রুচি প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়, আর ইহজন্মের কর্ম্মবাসনা ইহজন্মেই উদ্বুদ্ধ হইলে তাহা স্মরণ বা প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হয় এবং মনুষ্য যখন যে যোনি প্রাপ্ত হয় তখন কেবল সেই জাতীয় বাসনাই অভিব্যক্ত হয়, মধ্যে ব্যবধান থাকিলেও তাহার ব্যাঘাত হয় না। প্রথমজীবের প্রথমপ্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিল? ইহার উত্তরে কর্ম্মবাসনাপ্রবাহকে অনাদি বলা হইয়াছে, আর যোগের দ্বারাই ঐ প্রবাহের গতিভঙ্গ হইতে পারে। যোগীরা বলেন বস্তুমাত্রই স্থায়ী এবং ত্রিগুণাত্মক।

৫। ভেড়াঘাট। ভেড়াঘাট নর্ম্মদার একটী প্রপাতের জন্য বিখ্যাত, ইহা জব্বলপুরের নিকট এবং ইহার নিকটে শ্বেতপ্রস্তরের পর্ব্বত আছে।

৬। ভাউ সাহেবের বখর। শ্রীজ্ঞানদা নন্দিনী দেবী)। ইহা একখানি মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাস। মহারাষ্ট্রপ্রতাপের চরম-উৎকর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার অবনতিপথে যাত্রায় শেষ হইয়াছে,—১৫৫৪ হইতে ১৭৬১ অব্দ পর্য্যন্ত ইহার সময়। ১৭৮১ অব্দে গ্রন্থ লিখিত হয়। লেখক—কৃষ্ণাজী শ্যামরাও, গ্রন্থখানি পত্রাকারে লিখিত, পত্রখানি গোবিন্দপুরের জায়গীরদার বাঁকাপা নাইক দিলখুষকরের উদ্দেশে লিখিত।

৭। ভারতবর্ষের ধর্ম্মপ্রণালী। (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)। মনুসংহিতাপ্রতিপাদিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কেন্দ্রস্থান সমাজ অর্থাৎ লোকস্থিতি। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে জন্মান্তর মানাতে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের ফল পরজন্মের সুখ—বাইবেলে এতদ্বিষয়ে কোন পরিষ্কার কথা নাই। সমাজের মঙ্গলের দিকেই মনুর লক্ষ্য, সমাজের মঙ্গলের জন্য জন্মান্তর, সমাজের সুবিধার জন্য জাতিভেদ, সমাজের জন্য চতুরাশ্রম। তিনি মনুষ্যের মনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অশেষবিধ বৃত্তির কোন বৃত্তিকেই পরিহার করেন নাই এবং তাঁহার সমাজবন্ধন অটল। কিন্তু জৈমিনি বেদকে বাজাইতে গিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে কমাইয়া ফেলিয়াছেন।

৮। স্থানমান। (উপক্রমণিকা—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)। ইউক্লিডের বিন্দুসংজ্ঞার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া লিখিত হইয়াছে যে স্থানমান সাধারণ গণিতবিদ্যার একটী শাখা;—বীজগণিত সেই সাধারণ

গণিতবিদ্যা। এজন্য উচিত এই যে, বালকদিগকে অগ্রে বীজগণিতের অন্ততঃ অমিশ্রসমীকরণ পর্য্যন্ত শিখাইয়া তাহার পর স্থানমান ধরান হয়।

৯। অদ্বৈতবাদের সমালোচনা।—শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজদাস দত্ত প্রণীত অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধীয় (ইংরাজিভাষায় লিখিত) গ্রন্থের সমালোচনা।

বান্ধব। চৈত্র, ১২৮৯।

১। আত্মনির্ভর।

২। অগ্নিকুল। (উপন্যাস)।

৩। প্রাচীন ভারত। (শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ)

৪। হিন্দুদিগের অবনতি।

৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সার মর্ম্ম।

৬। আয়ুর্ব্বেদ।

বহুদিন হইতে বান্ধব-সম্পাদক নিজে লিখিতে পারিতেছেন না—সুতরাং বান্ধবের আর সে দিন নাই। এসংখ্যায় 'আত্মনির্ভর ও 'হিন্দুদিগের অবনতি' এই দুইটী ব্যতীত অন্যান্য প্রবন্ধগুলি পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর—ক্রমশঃ প্রকাশ্য। আত্ম-নির্ভর প্রবন্ধটী ক্ষুদ্র হইলেও সুখপাঠ্য ও সারগর্ভ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সারমর্ম্ম কথোপকথনচ্ছলে অতি সহজভাষায় লিখিত। ইহা পাঠদ্বারা সাধারণ পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন 'গীতা' কি।

প্রবাহ—ফাল্গুন, ১২৯০।

১। ভারতীয় রাজকুলদর্পণ। (শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়)—৭ম ও ৮ম অধ্যায়।

২। ন্যায়-দর্শন (শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র শিরোমণি)।

৩। হৃদয়ের দুর্ব্বলতা। (শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর সিদ্ধান্ত)।

৪। শৈশব মৃত্যু ও পীড়া। (শ্রীযুক্ত সার্জ্জন ধর্ম্মদাস বসু, এল্, আর্, সি, পি; এল, আর্, সি, এস্, —এডিনবরা)—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। "অন্নপ্রাশনের পর হইতেই শিশুকে অন্নাহার করাইলে যে প্রকার অনিষ্ট, পাঁচ ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন আহার করাইলেও সেই প্রকার অনিষ্ট হয়, অর্থাৎ উভয় স্থলেই শিশুর নানা প্রকার পীড়া হইতে দেখা যায়। শিশুকে ক্রমে ক্রমে শ্বেতসারযুক্ত ও গুরুপাক আহার দেওয়াই বিধি। মাতৃস্তন্য শিশুর অব্যবহার্য্য হইলে যে ধাত্রীর স্তন্যপান করান হইয়া থাকে, তাহার বয়স ১৮ হইতে ৩০ বৎসরের অধিক হওয়া উচিত নহে, তাহার সন্তান থাকিলে তাহার বয়স শিশুর বয়সের প্রায় সমান হওয়া আবশ্যক, এবং ধাত্রীর শরীর রোগমুক্ত ও মনের অবস্থা ভাল হওয়া প্রয়োজন। ধাত্রীর অভাবে গর্দ্দভীর দুগ্ধ প্রশস্ত, তদভাবে চূণের জল ও শর্করামিশ্রিত গাভীদুগ্ধ ব্যবস্থা। অল্পদিনের জন্য হইলে সুইজারলণ্ড দেশীয় টিনের দুগ্ধও মন্দ নহে। সন্তানকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল, সন্তুষ্ট ও নির্ভয় রাখিতে চেষ্টা করিবে। অন্ত্রের মধ্যে কৃমি থাকিলে শিশুদিগের নানা প্রকার পীড়া হয়। কৃমির বীজ খাদ্য ও পানীয়ের সহিত শরীরে প্রবেশ করে। অতএব খাদ্য ও পানীয় যেন দূষণীয় না হয়। দন্তোদ্গমের সময় শিশুর অসুস্থতা জন্মে বলিয়া এই সময়ে সামান্য কারণে পীড়া জন্মিতে পারে এবং ক্রোধ, অভিমান, বিরক্তি

ইত্যাদি বৃদ্ধি হয় বলিয়া ৪।৫টী দন্ত বাহির না হইলে কোন প্রকারে শিশুকে উত্তেজিত বা ভীত করা অকর্ত্তব্য। এই সময়ে খাদ্য ও পানীয়ের বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন এবং স্বাভাবিক নিদ্রার ব্যাঘাত করা নিষিদ্ধ। সংক্রামকরোগের বীজ হইতে শিশুদিগকে দূরে রাখা উচিত"। গৃহস্থমাত্রেরই এই সকল কথা জানা কর্ত্তব্য, অতএব এ সকল বিষয় যতই বহুলরূপে প্রকাশিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল।

৫। বিদ্যুল্লতা—উপন্যাস। (শ্রীযুক্ত "জয়চাঁদ") ১৭শ, ১৮শ ও ১৯শ পরিচ্ছেদ।

৬। ভ্রমণ বৃত্তান্ত। (শ্রীযুক্ত পরেশনাথ দাস) —পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।—গয়া।

৭। নিশা বন্দনা—পদ্য। (শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গঙ্গোপাধ্যায়)।

৮। সমাজসংস্কার। (ঐ)—২—স্ত্রী শিক্ষা।

৯। পাট। (এক জন বণিক্)। প্রবন্ধটীতে বিশেষ জ্ঞাতব্য কোন কথা নাই। তবে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি বিষয়সকল নিয়ত আলোচিত হয় ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিছুদিন হইল 'বৈষয়িকতত্ত্ব' এই উদ্দেশ্যে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার 'অন্তর্ধ্যানে' আমরা বস্তুতই দুঃখিত হইয়াছি।

নব্যভারত—ফাল্গুন, ১২৯০। ১ম খণ্ড, দশম সংখ্যা।

১। সভ্যতা। (পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ)।

২। বাহির বা ভিতর। ধর্ম্মনীতিঘটিত প্রবন্ধ।

৩। লক্ষ্যপথে।

৪। জীবনগতি-নির্ণয়। (শ্রীচণ্ডীচরণ সেন)। ষষ্ঠ অধ্যায়—সামাজিক বিশ্লেষণ।

৫। বাল্মীকি ও বেদব্যাস। (শ্রীগোপীচন্দ্র সেন)। দ্বৈপায়নপ্রোক্ত ইতিহাস বলিলে দ্বৈপায়নের রচিত ইতিহাস, কেননা সৌতি তাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন। যদি বলা যায় যে, দ্বৈপায়ন মহাভারতও কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা হইলে যে সকল কবি উত্তরকালে মহাভারত নকল করিয়াছেন তাঁহাদিগকে কি মহাভারতরচয়িতা বলিতে হইবে? অতএব "আচখ্যুঃ" এবং "প্রোক্তং" এ দুই কথার প্রকৃত অর্থ ব্যবহৃত হয় নাই। মহাভারতে "কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় নমঃ" দেখিয়া অনেকে বলেন যে, মহাভারতসমস্ত দ্বৈপায়নকৃত হইলে তিনি আপনাকে আপনি নমস্কার করিতেন না। এ কথার উত্তর এই যে, যে অর্থ সঙ্গত তাহাই গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। কথাটী ব্যাসের নিজের নহে যাঁহারা তাঁহার মহাভারত পাঠ বা নকল করিয়াছেন এ লেখা তাঁহাদিগের। কোন্ স্থান হইতে মহাভারত আরম্ভ হইয়াছে তৎপক্ষে মতান্তর আছে বলিয়া প্রমাণ হইল না যে মহাভারত বহুজনবিরচিত। কিন্তু তাহাতে যে সকল শ্লোক দৃষ্ট হয় তাহাতে এমন বলিলেও সৌতি যেমন মূলবক্তা আর বৈশম্পায়ন উপবক্তা তেমনই ব্যাসই প্রকৃত গ্রন্থ রচয়িতা আর কেহ কিছুই নহে। সৌতি যদি মহাভারত কীর্ত্তন করিলেন তবে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিল কে? তাহার নাম নাই কেন? স্বয়ং ব্যাসই এইরূপ বক্তা, শ্রোতা, প্রশ্নকর্ত্তা, উত্তরদাতা ইত্যাদির স্বর-

ভাবণা করিযা লিখিয়া গিযাছেন—গণেশ তাঁহাব লেখক—এ কথা কাযেব নহে। স্বপ্রণীত গ্রন্থেব বিশেষ প্রশংসা করিয়া লোকেব শিক্ষাব জন্য প্রবৃত্তি জন্মানই এই সকলের প্রধান উদ্দেশ্য।"

৬। লোকসংখ্যা। (শ্রীসিদ্ধেশ্বব রায) —পূর্ব্ব প্রকাশিতেব পব।

৭। নবলীলা—উপন্যাস। (শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায চৌধুবী)।

৮। শঙ্কবাচার্য্য। (শ্রী দ্বিজদাস দত্ত, এম, এ)

৯। শাক্যচবিত, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ দর্শন। (শ্রীক্ষীবোদচন্দ্র রায চৌধুবী, এম, এ)—পূর্ব্ব প্রকাশিতেব পব।

মাস সমালোচন।

বাজনীতি।

ইয়ুবোপীয বিটিশপ্রজাদিগেব স্বপক্ষে ফৌজদাবী আইন বিধিবদ্ধ হওযাব পর হইতে ভাবতীয বাজনৈতিকগণ পুনরায শান্তমূর্ত্তি ধাবণ কবিযাছে।

ইয়ুবোপীয বিটিশপ্রজা একতাসম্পন্ন, সুতবাং বলবান। ভারতীয বিটিশপ্রজা একতাবিবর্জ্জিত, সুতবাং দুর্ব্বল। ভাবত গবর্ণমেণ্ট, ন্যাযেব অনুবোধে বলবানেব কবলগ্রাস হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা কবিবাব মানসে, বলবানেব অন্যায ও অসঙ্গত অধিকাবেব প্রতি ঈষৎ হস্তোত্তোলন কবিযা বিষম শঙ্কটাপন্ন হইযাছিলেন। বলবান্ ভ্রুভঙ্গী করিতেছিল,—সমগ্র শাসনযন্ত্র খণ্ড বিখণ্ড কবিয়া বঙ্গোপসাগরের অতলগর্ভে নিক্ষেপ কবিবে বলিতেছিল। এক দিন—দুই দিন—তিন দিন,—গবর্ণমেণ্ট আর সহ্য করিতে পারিলেন না। রণে ভঙ্গ দিলেন;—আতঙ্কে আতঙ্কারিহস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। ন্যায় সঙ্কুচিত, মর্ম্মাহত ও মৃতবৎ হইয়া পড়িল। অন্যাযেব রাজ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত হইল। যাহা হউক, শত্রুশিবিরে যাইযা গবর্ণমেণ্ট রাজ-নৈতিক শঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইলেন।

রাজ্যের মধ্যে যাহারা বলবান তাহাদিগকে কোনরূপে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে, দুর্ব্বলকে শাসন বা পালন করিবাব জন্য বিশেষ কোন রাজনীতিব আবশ্যক হয না। যেরূপ হয একটা নীতি বা অনীতির অনুসরণ করিলেই হইতে পারে। ভাবতগবর্ণমেণ্ট বলবানকে সন্তুষ্ট কবিযাছেন, অতএব রাজ্যেব আভ্যন্তরিক শাসনসম্বন্ধীয যে কিছু চিন্তা তাহা সমস্তই প্রায় বিদূরিত হইয়াছে। দুর্ব্বলেব জন্য চিন্তার বিষয় কি? তাহাব ভাগ্যে যখন যাহা লিখিয়াছেন, শোভা পাইয়াছে; এখনও যাহা লিখিবেন, শোভা পাইবে,—অবশ্য তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে ইহার মধ্যে একটী কথা আছে।

দুর্ব্বল পূর্ব্বে যেরূপ দুর্ব্বল ছিল এখনও প্রায় তদ্রূপই আছে;—সবল হইবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করে নাই,—চেষ্টা করিবার

তাদৃশ ইচ্ছা আছে বলিয়াও বোধ হয় না। অতএব তাহাদিগের কথা ধরি না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিজের বল কোথায়? যে গবর্ণমেণ্ট সসাগরা ভারতসাম্রাজ্যের উপর শাসনদণ্ড পরিচালন করেন,—যাঁহার প্রতাপপতাকা হিমালয়ের অভ্রভেদী উচ্চতম শৃঙ্গে সংস্থাপিত,—শক্তির অবতারস্বরূপ সেই গবর্ণমেণ্টের এতাধিক নৈতিকদুর্ব্বলতা হইতে পারে, ইহা কে কবে স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল? আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল, সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতার সমষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু তথাচ বলিতে কি, ভারতসাম্রাজ্যের উচ্চতম শাস্ত্রদিগের দুর্ব্বলতা দেখিয়া আমরাও লজ্জিত হইয়াছি। শক্তি-বিহীনতায় লর্ড রিপনের গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীকেও পরাভূত করিয়াছেন।

বলবান্ ও দুর্ব্বল উভয়ের মধ্যে শক্তি ও স্বত্বাধিকারের সাম্যসংস্থাপন করাই উৎকৃষ্ট রাজ্যতন্ত্র শাসনপ্রণালীর পরিচায়ক। যে শাসনপ্রণালী সম্যক্‌রূপে ন্যায়ের পক্ষপাতী ও সবল, তাহাই উৎকৃষ্ট; যেহেতু তদ্দ্বারা উল্লিখিত সাম্য সংস্থাপিত হয়। সাম্য ব্যতিরেকে প্রকৃত শক্তি অসম্ভব। ইল্‌বার্ট্ বিলের অযথা যুক্তি ও নিষ্পত্তির দ্বারা গবর্ণমেণ্ট যে জঘন্য ও জারজ শান্তি ক্রয় করিয়াছেন, তাহা শান্তি নামেরই উপযুক্ত নহে। বৈষম্য ও ব্যভিচারের নামান্তর মাত্র।

যাহা হউক্ ভারতীয়জাতি সুখে দুঃখে কখনই রাজদ্রোহী নহে। রাজভক্তি তাহাদিগের স্বভাবের, শিক্ষার ও ধর্ম্মের অন্যতম অংশ। বহু আশায় নিরাশ হইল,—তাচ্ছিল্যীকৃত, অপমানিতও লাঞ্ছিত হইল,—কিন্তু তবুও তাহাদিগের প্রগাঢ় রাজভক্তির কণামাত্র বিচ্ছিন্ন হইল না। ইল্‌বার্ট আইন উৎসর্গ হওয়ার অব্যবহিত পরেই রাজপ্রতিনিধি, নিজামের রাজ্যাভিষেক-উপলক্ষে, হায়দ্রাবাদ গমন করিলেন। কিন্তু দেখ, কি আশ্চর্য্য!—দক্ষিণাপথবাসীরা তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইল,—তাচ্ছিল্য, অপমান, নৈরাশ্য—সমস্ত ভুলিয়া মুক্তহস্তে প্রতিনিধিকে গ্রহণ করিল, ইষ্টদেবতাবৎ তাঁহার পূজার্চ্চনা করিল। গত ডিসেম্বর মাসে লর্ড্ রিপন সিমলাশৈল হইতে যে দিন কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন সেই দিন তাঁহার স্বদেশীয়গণ তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল সেই ব্যবহারের সহিত মান্দ্রাজের এই পূজার্চ্চনার কিঞ্চিৎ তুলনা করিলেই প্রতিনিধি বুঝিতে পারিবেন, ভারতীয় ব্রিটিশপ্রজা কিরূপ রাজভক্ত ও ইয়ুরোপীয় ব্রিটিশপ্রজা কিরূপ রাজদ্রোহী। বস্তুতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যপ্রকৃতির অন্যান্য বিভিন্নতার মধ্যে উপরোক্ত দুইটী বিভিন্নতাও বিলক্ষণ সুস্পষ্ট। কিন্তু তথাচ দেশীয় শিক্ষিতসম্প্রদায়ের প্রতি রাজভক্তিবিহীনতার অন্যায় নিন্দাবাদ আরোপিত হওয়ার কারণ কি? কারণ—যাঁহারা নিন্দা করেন তাঁহারা ভিন্ন—অন্যে অবগত নহে।

ইল্‌বার্ট্ বিলের আন্দোলন জনিত ক্লান্তি ও অবসাদ পরিহার করিয়া ভারতীয় 'মুদ্রাযন্ত্র' ক্রমশঃ সঞ্জীবভাব ধারণ করিতেছে। বিগত মাসে দেশীয় সংবাদপত্রসমূহে সাধারণতঃ যে সকল বিষয় আন্দোলিত ও বিতর্কিত হইয়াছিল তন্মধ্যে স্বায়ত্তশাসন, বঙ্গীয় মিয়ুনিসিপাল ও রেণ্ট্ বিল, কোর্ট ফী বা ষ্ট্যাম্প-আইনের পাণ্ডুলিপি, মিশরযুদ্ধ ও কলিকাতা-প্রদর্শনী প্রধান। গতমাসের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রসঙ্গে উল্লিখিত বিষয়গুলির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

১। স্বায়ত্তশাসন মিয়ুনিসিপাল বিল। শেষোক্তের কার্য্যকারিতা দেখিয়া প্রথমোক্তের প্রবর্ত্তন করা ছোটসাহেবের মত। তিনি বলেন, "মিয়ুনিসিপাল বিল এ বৎসর 'পাস' হউক, আগামী বৎসর স্বায়ত্তশাসনের বন্দোবস্ত করা যাইবে।" নির্ব্বাচন-প্রথা-বিশিষ্ট মিয়ুনিসিপালিটী ও স্বায়ত্তশাসন উভয়ই অনেকাংশে তুল্য মূল্য, অতএব নূতন মিয়ুনিসিপাল-বিল 'পাস' হইলে দেশের অনেকস্থলেই আত্মশাসনাধিকার প্রদত্ত হইবে। এই অধিকার কিরূপে ব্যবহৃত হয় ও তদ্দ্বারা সরকারী কার্য্য কিরূপ চলে দেখা যাইবে এবং তাহা দেখার পর সর্ব্বপ্রসারী স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধীয় নিয়মাদি সংগঠন করিয়া উহা প্রবর্ত্তিত করা বিলক্ষণ সহজ হইবে। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া টমসন সাহেব 'স্বায়ত্ত শাসন' আপাততঃ কিছুকাল স্থগিত রাখিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তাঁহার মতে নূতন মিয়ুনিসিপাল-বিল ও স্বায়ত্তশাসন উভয়ের যুগপৎ মীমাংসা ও প্রবর্ত্তন করা অসম্ভব ও অবিধেয়। পরন্তু বঙ্গদেশ আত্ম-শাসনপক্ষে অধিকতর উপযোগী হইলেও তথায় যে উহা এতদিনের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হয় নাই, এ ত্রুটি ছোটলাটবাহাদুর নিজের স্কন্ধে লইতে প্রস্তুত নহেন। তিনি টেষ্ট্ সেক্রেটারী মহোদয়কেই এ বিষয়ের জন্য দোষ দেন, অর্থাৎ বলেন যে, যদি সেণ্ট্রাল্ বোর্ড সম্বন্ধীয় প্রস্তাব মঞ্জুর হইত ও তাহাতে আপত্তি উত্থাপিত না হইত, তাহা হইলে বঙ্গে আত্মশাসন প্রচলিত হইতে এত কালবিলম্ব হইত না। দোষগুণ যাঁহারই হউক, এ কথা নিশ্চয় যে, বঙ্গদেশ আত্ম-শাসনের অধিকতর উপযোগী সত্তেও বাঙ্গালিদিগকে অদ্যাপি তাহা প্রদত্ত হয় নাই এবং শীঘ্র হইবারও সম্ভাবনা অতি অল্প। আর আত্মশাসনটাই বা কি? কথাটা খুব জাকাল বটে, কিন্তু কথাটা 'কি?—দুইটা মেঠোরাস্তা মেরামত আর একটা গ্রাম্য পাঠ-শালারতত্ত্ব বধান। এই অতি যৎসামান্য অধি-কারটীও দেশীয় লোকদিগকে দিতে টমসন সাহেব কিজন্য কাতর হইতেছেন তাহা তিনি নিজে ভিন্ন আর কে বলিতে পারে?

২। কোর্ট্ ফীস্ বিল্—ভারত-বর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় 'পেশ' আছে। বিচারকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ বিচারপ্রার্থীদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত হইবার জন্য কোর্ট্ ফীসের সৃষ্টি। কিন্তু কলিকাতা হাই-কোর্টের উচ্চতম বিচারপতি সার্ বিচার্ড গার্থের মন্তব্যে যেরূপ প্রকাশ, তাহাতে কেবল বিচারকার্য্যের ব্যয়নির্ব্বাহার্থেই "কোর্টফীস" গৃহীত হয় না। প্রত্যুত, "কোর্টফীস্" প্রকারান্তরে গবর্ণমেণ্টের একটী বিলক্ষণ লভ্যজনক ব্যবসা। বিগত ১৮৮২ সালে "কোর্টফীস" বিক্রয়দ্বারা ৬৬, ১২, ৯৩৩ টাকা আয়ের মধ্যে ১৩,৯৬,-০৬১ টাকা মাত্র ব্যয় হইয়াছে, সুতরাং ৩২,-১৬, ৮৬৭ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। এত-দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, ব্যবসাটী বড় সামান্য নহে; ইহার প্রতিটাকায় আট আনা করিয়া লাভ থাকে। বিচারবিক্রয়ের (!) ব্যবসা করিয়া টাকায় আটআনা লাভ করা, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে লজ্জাকর নয় কি? কোর্টফী সম্বন্ধে গার্থ সাহেব তাঁহার মন্তব্যটী প্রকাশ করিয়া যথার্থই আমাদিগের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। দেখা চাই, এক্ষণে আইনবিধাতৃগণ এতৎসম্বন্ধে কিরূপ নীতি

অনুসরণ করেন। অনেক বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের 'ঘরের খবর' কি লোকে তাহা জানে না দেশীয় রাজনীতিকগণের উচিত যে, তাঁহারা শাসনপ্রণালীসম্বন্ধীয় গূঢ় ও গুহ্য কথাসকল সম্যক্‌রূপে জানিয়া তত্তদ্বিষয়ের আন্দোলন করেন। নতুবা ভিত্তিশূন্য আন্দোলনে বিপরীত ফললাভেরই সম্ভাবনা।

৩। রেণ্ট-বিল।—গত মাসে নির্ব্বাচিত 'কমিটী'-কর্ত্তৃক এই বিল্‌' পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিতর্কিত হয়। 'কমিটী' ইহার ভাবষ্যদাশার সম্বন্ধে কিরূপ মীমাংসায় উপস্থিত হইবেন, এখনও বলা যায় না। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সুচতুর সেক্রেটারি মিঃ ম্যাক্‌ডোনেলের অভিমত যে 'বিল'খানি শীঘ্রই আইনে পরিণত হয়। কিন্তু 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান'-সম্পাদক যেরূপ বলেন তাহাতে এই 'বিল' আগামী শীতঋতুর পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ না হওয়ারই সম্ভাবনা। দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে অধিকাংশ বিলের বিরুদ্ধবাদী, অল্পাংশই ইহার স্বপক্ষে মত দিয়াছেন। কেহ কেহ পরিবর্ত্তিত আকারে 'পাস' করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। জমিদার মহাশয়েরা আন্দোলনে বিরত হন নাই। প্রজা কি বুঝে ও তাহার কে আছে যে তাদৃশ আন্দোলন করিবে? তবে যে স্থলে প্রজা 'জববদস্ত',—জমিদারের খাজনা বন্ধ করিতে ত্রুটি করিতেছে না। পূর্ব্ববঙ্গে এইরূপ ঘটনা কিছু অতিরিক্ত। যাহা হউক, এই 'বিল' আইনে পরিণত হইলে ইহার কার্য্যকারিতা কিরূপ দাঁড়াইবে, কোন পক্ষই নিশ্চিত বলিতে পারেন না,—বলা অসম্ভব; এই আইনদ্বারা প্রজাজমিদারের বিসংবাদ ও মোকদ্দমার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইয়া পাছে উভয়েই উৎসন্ন যান ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মস্তকে কুঠারাঘাত হয়, ইহাই আমাদিগের আশঙ্কা। গবর্ণমেণ্ট উভয় পক্ষের প্রতি সমান ব্যবহার করিবেন ও চিরস্থায়ী চুক্তি ভঙ্গ করিবেন না—এমত আশা আমরা এখনও করিতে পারি। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট নিজের 'খাসমহলের' প্রজার বিষয়টা কিরূপ বিবেচনা করিতেছেন? ইহাদের অবস্থা কি জমিদারের প্রজা অপেক্ষা শোচনীয় নহে?

৪। মিশর-বিদ্রোহ।—মিশরের ব্যাপারে ক্রমশঃই গাঢ়তর হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং সেই ব্যাপারে ইংলণ্ডও ক্রমশঃ জড়ীভূত হইয়া পড়িতেছেন। 'মাহাদির' সৈন্যবল ও পরাক্রম প্রথমতঃ যেরূপ সামান্য জ্ঞান করা হইয়াছিল, বস্তুতঃ তাহা নহে। জেনারেল হিক্‌স্‌-পরিচালিত সৈন্যদলের সম্যক্‌ বিলয়প্রাপ্তি বড় একটা সহজ ঘটনা নহে। এই ঘটনার পর হইতেই যেন মাহাদির প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। ব্রিটিশ সৈন্য গত মাসে উপর্য্যুপরি দুইটী যুদ্ধে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও যে সেই প্রভাব শীঘ্র বিলুপ্ত হইবে এমত বোধ হয় না। বিশেষতঃ স্বাধীনতা-প্রমুখ যুদ্ধানল শীঘ্র নির্ব্বাপিত হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প। আরাবির পতনে মাহাদির অভ্যুত্থান, মাহাদির পতনে আরও শত শত মাহাদি মস্তকোত্তোলন করিবে না—কে বলিতে পারে? শুনা যাইতেছে, ভারত হইতে সৌদানে সৈন্য প্রেরিত হইবে। সৈন্য প্রেরিত হইলেই ভারতকে তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে,—আমাদিগের সেই আশঙ্কা।

৫। কলিকাতা প্রদর্শনী।—গত মাসে প্রদর্শনী শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা যে কিছু স্থায়ী ফললাভের সম্ভাবনা থাকে তাহা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। জুবার্ট সাহেবের নিজের কথায় যেরূপ প্রকাশ-তাহাতে প্রদর্শনীর দ্বারা তাঁহার বড় আর্থিক লাভ হয় নাই।

৬। আবকারী কমিসন বেহারের নানা স্থানে তদন্ত শেষ করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে যাইবেন না। তথায় কি খোলাভাটী নাই? গত কয়েক সপ্তাহে 'মাণিকপুরের মারপিট মোকদ্দমার' বিষয় লইয়া মুদ্রাযন্ত্র বিলক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন। এই হতভাগ্য দেশে মাণিকপুরের ঘটনার ন্যায় ঘটনার কখনই বিরল নহে! তবে মিঃ ইয়ঙের ন্যায় ন্যায়বান বিচারপতি বিরল হইতে পারে।

গত মাসে বাঙ্গালা ও বেহারের স্থানে স্থানে অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছিল। খাদ্য দ্রব্য সর্ব্বত্রই দুর্ম্মূল্য। প্রকৃত প্রস্তাবে দুর্ভিক্ষ না হইলেও শস্যাদির মূল্য ঠিক তদনুরূপ হইয়াছে। বেহারের সকল স্থানেই বিশেষতঃ ভাগলপুর ও ত্রিহুতের নিম্নশ্রেণীস্থ অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। জেলার মাজিষ্ট্রেট দিগের উচিত এবিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন। সরকার হইতে যে সকল নূতন রেলওয়ে খুলার কথা আছে তাহাদিগের কার্য্য এই সময়ে আরম্ভ হইলেই ভাল হয়।

সমাজ।

গত মাসের প্রধান সামাজিক ঘটনা নলডাঙ্গার বিধবাবিবাহ। শুনা যাইতেছে যে, এই বিবাহে হিন্দুসম্প্রদায়ের সম্যক্ সহানুভূতি ছিল। কথা প্রকৃত হইলে, আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই।

বিগত মাস হইতে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে' অতি শোচনীয় একটী বিসম্বাদ চলিতেছে। যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য প্রকাশ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারাও যখন স্বার্থপর সংসারীর ন্যায় কলহ করিতে প্রবৃত্ত, তখন আর কিরূপে লোকের ধর্ম্মে আস্থা থাকিবে? এখনও সময় আছে, ব্রাহ্মপ্রচারকগণ সাবধান হউন। আত্মবক্তপান করিয়া আর লোকধর্ম্ম হাসাইবেন না। কেশবচন্দ্র সেনের নির্ম্মল জীবনে অযথা কলঙ্ক আরোপিত হইতে দেওয়া তাঁহাদিগের উচিত নয়। ফলতঃ তাঁহাদিগের বিসম্বাদে কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের নয়, ধর্ম্মমাত্রেরই অনিষ্ট হইতেছে।

কলিকাতা প্রদর্শনী-'প্রণেতা' জুবার্ট সাহেব বঙ্গীয় সমাজসংস্কারকদিগের 'অন্ন মারিতে' চাহেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার প্রদর্শনী দ্বারা অন্তঃপুররুদ্ধা অসূর্য্যম্পশ্যা কুলমহিলারা আকর্ষিত হইয়া প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন, অতএব তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ-সংস্কারক নামের যোগ্য। একথার উত্তরে আমাদের সংস্কারকসম্প্রদায় ও 'জেনানাবাদী' হিন্দু মুসলমানগণ কি বলেন শুনা আবশ্যক।

ঠঃ দঃ।

নানা কথা।

দেশ কাল-পাত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিভার পূজা হইয়া আসিতেছে। প্রতিভাসম্পন্ন মনুষ্যকে মনুষ্যমাত্রেই স্বভাবতঃপূজা করে। মনুষ্যের এই মনুষ্যপূজা অবশ্যম্ভাবী। ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা বৃথা।

কারলাইল বিপুল প্রতিভাশালী ব্যক্তি এবং বর্ত্তমান যুগের একজন প্রধান শিক্ষক। কারলাইল নিজে মহাপুরুষ হইয়াও মহাপুরুষের পূজা করিতেন। প্রকৃত মাহাত্ম্য ও প্রতিভা কাহাকে বলে, কারলাইল যেমন চিনিতেন অন্যে তেমন চিনিত না, এই জন্যই, বোধ হয়, কারলাইল মহাপুরুষ।

প্রতিভার সহিত পবিত্রতার সংমিলন যেমন দুর্লভ, তেমনি মধুর। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জীবনে প্রতিভা পবিত্রতার সহিত সংমিলিত হইয়াছিল, অতএব আস্তিক নাস্তিক উভয়েই কেশবের পূজা করিল।

কেশবের প্রকৃত 'জীবনী' দ্বিতীয় কেশব ব্যতীত অন্যে লিখিতে পারিবে—আমরা এমত বিবেচনা করি না। কেশবের প্রকৃতজীবন আর কিছুই নহে, কেবল একটী মহৎ ও নিগূঢ়ভাব। সেই ভাবটী যিনি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিবেন—উপলব্ধি ও অনুভব করিতে পারিবেন—তিনিই কেশবের প্রকৃত জীবনচরিত লিখিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু সেই ভাবটী এত গভীর, এত আধ্যাত্মিক, যে তাহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করা সহজ নহে। যে কেশবের আধ্যাত্মিকতা পরিমাপ করিতে পারিবে সেই বলিতে পারিবে কেশব, প্রকৃত প্রস্তাবে, কি ছিলেন।

'ইণ্ডিয়ান্ ডেলিনিউস্' বলেন, কেশব চন্দ্র সেন বাগ্মিতায় গ্লাডষ্টোন, ব্রাইট ও গাম্বেতার সমকক্ষ অর্থাৎ কেশব বর্ত্তমান কালের সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর বক্তা ছিলেন।

কেশবের ইংরাজি ভাষা ও মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে 'ডেলিনিউস্' এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

"Few Englishmen of any age had a more thorough command of the subtler resources of the English tongue He could sound the depths of metaphisics and whilst commanding wonder and admiration at the power of his fancy and the vigour and the richness of his imagination, he could also at will unlock the closest gate of feeling." "ইংরাজী ভাষার অতি গোপনীয় বৈভবেও কেশবের সম্যক অধিকার ছিল, তাহা অপেক্ষা অধিক অধিকার, কোনকালে কোন শিক্ষিত ইংরেজেরও থাকা সম্ভাবিত নহে।" অনেক বিদেশীয়ের ইংরাজী-অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ইংরাজসমালোচকের এ প্রকার মন্তব্য বড় সুলভ নহে। কিন্তু কেশব নিজে এত বিনয়ী ছিলেন যে তিনি বলিতেন যে, "আমি আর আর বিষয় জানি না জানি, এইটী আমি নিশ্চয় জানি যে আমি ইংরাজী জানি না।

পাক্ষিক সমালোচক।

প্রথম খণ্ড।] সন ১২৯০সাল, চৈত্র, দ্বিতীয় পক্ষ। [চতুর্থ সংখ্যা।

সমালোচনা ও সমালোচক।

১

কোন দ্রব্যের স্বরূপনির্ণয় করিতে হইলে তাহার সমালোচনা করা প্রয়োজন। সভ্য জগতে দ্রব্যমাত্রেরই যথাসম্ভব স্বরূপ নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং সমালোচন অবশ্যম্ভাবী। মনুষ্যের চিন্তাশক্তি তাহার জ্ঞানমাত্রের মৌলিক কারণ। সমালোচনা চিন্তা-শক্তি পরিচালনের নামান্তরমাত্র। জ্ঞানমাত্রেরই মূলে সমালোচনা স্বতঃনিহিত। সমালোচনারূপ সোপান দ্বারা'ই মনুষ্য জ্ঞানরূপ উচ্চশৈলে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। সমালোচনা ব্যতিরেকে জ্ঞান অসম্ভব। বস্তু হইতে অবস্তু বা অবস্তু হইতে বস্তুজ্ঞান জন্মে। বস্তু কি জানিতে হইলে অবস্তু কি—ইহা জানাও এক রূপ অপরিহার্য্য অর্থাৎ উভয়ের স্বরূপ ও পারস্পারিক সম্বন্ধ কি ইহা স্থির করা প্রয়োজন। এই স্বরূপ ও সম্বন্ধস্থিরীকরণ প্রক্রিয়াকেই সাধারণতঃ সমালোচনা বলি। সমালোচনপ্রক্রিয়া প্রধানতঃ কিরূপে সম্পাদিত হয় ও তাহার মৌলিক প্রকৃতি কি, প্রথমতঃ তাহাই আলোচনা করিব।

পদার্থ-তত্ত্ববিৎ স্থির করিলেন যে, পদার্থ* (matter) আর কিছুই নয়,—কতকগুলি স্বরূপ বা ধর্ম্মের (Properties) সমবায়মাত্র। এই স্বরূপ বা ধর্ম্ম দ্বিবিধ,—স্থির ও অস্থির। স্থির ধর্ম্ম,—যথা,—ভার, বিস্তার, স্থানবোধকত্ব, বিভাজ্যতা, স্থিতিস্থাপকত্ব, ইত্যাদি। অস্থির ধর্ম্ম যথা,—আকুঞ্চনীয়তা, প্রসারণীয়তা, তরলতা, তরলতা, শীতলতা, উষ্ণতা, কাঠিন্য, কোমলতা, ইত্যাদি।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পদার্থের এই সকল স্বরূপ বা ধর্ম্ম মূলতঃ কিরূপে স্থিরীকৃত হইল? ভারত্ব বা স্থানবোধকত্ব, বিভাজ্যতা বা স্থিতিস্থাপকত্ব, তরলতা বা কাঠিন্য—এরস্থির এক একটী স্বরূপের অস্তিত্ব আছে, বৈজ্ঞানিক কিরূপে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন? উত্তর,—পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা। কিন্তু সেই পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষার প্রকৃতি ও প্রকরণ কিরূপ? সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে অনুভূত হইবে যে, কোন একটী স্বরূপের ভাব উপলব্ধি বা নির্ণয় করার পূর্ব্বে বা অন্ততঃ সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিপরীত ভাবের কল্পনা করা অপরিহার্য্য। ভারত্ব কি জানিতে হইলে যুগপৎ ভারশূন্যত্বের কল্পনা করিয়া উভয়ের পার্থক্য অনুভব করি, নতুবা ভারত্বের ভাব কিরূপে বুঝিব? কোমলতার সহিত কঠিনতার বা কাঠিন্যের সহিত কোমলতার পার্থক্যানুভূতিই কোমলতা বা কাঠিন্যের ভাব হৃদয়ঙ্গম ও স্থিরীকরণের একমাত্র

* বলা বাহুল্য যে, এস্থলে পদার্থের সাধারণ ও স্থূল অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পদার্থের সূক্ষ্মতত্ত্বঘটিত ন্যায়দর্শনের তর্কে প্রবৃত্ত হই নাই।

উপায়। এইরূপে পদার্থের স্বরূপ বা ধর্ম্মের নিরূপণ করিতে তদ্বিপরীত স্বরূপের সহিত তাহার তুলনা করিয়া সম্বন্ধ স্থির করা প্রয়োজন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্বরূপনির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সম্বন্ধনির্ণয়-প্রক্রিয়ার আরম্ভ; অথবা স্বরূপনিরূপণ ও সম্বন্ধনির্ণয় উভয়ই পরস্পরের অনুগামী। একটীর সহিত অপরটী স্বভাবতঃ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ বা বিমিশ্র প্রক্রিয়াই মূলতঃ সমালোচনা। কথাটা পরিষ্কার হইল না, গুটিকতক উদাহরণ দিব।

১। বৈজ্ঞানিক গতির লক্ষণ স্থির করিতেছেন :—"একস্থান হইতে অপর স্থানে যাওয়ার নাম গতি (motion)। মনে কর, যেন আমি কোন গৃহে বসিয়া আছি, তখন তোমরা আমাকে স্থির বা গতিবিহীন বলিতে পার, কিন্তু তাহার পর যখন আমি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করি, তখন আমার অবস্থার নাম গতি। আর এক স্থানে স্থির হইয়া থাকার নাম স্থিতি। এই গতি ও স্থিতি নিরপেক্ষা ও সাপেক্ষা বা প্রত্যক্ষা উভয়ই হইতে পারে। গতি বা স্থিতি নিরপেক্ষা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। সচরাচর সাপেক্ষা গতি বা সাপেক্ষা স্থিতিই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, সেই জন্য ইহাদিগকে প্রত্যক্ষাও বলে। যখন কোন একটী বস্তু চলিতেছে, আর একটী স্থির রহিয়াছে দেখিতেছি তখন তুলনায় বলি এ চলে, ও স্থির; সুতরাং একের গতি ও অপরের স্থিতি পরস্পরের সাপেক্ষ।"*

২। পরন্তু সাহিত্যসমালোচক গীতিকাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন ;—

"যখন হৃদয় কোন একটা বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়, স্নেহ কি শোক কি ভয় কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয় তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটকের সামগ্রী। যে টুকু অব্যক্ত থাকে সে টুকু গীতিকাব্য-প্রণেতার সামগ্রী। যে টুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয় এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধহৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত তাহা তাহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে, বক্তব্য ও অবক্তব্য উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক ও গীতিকাব্যে এই একটী প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। * * * সত্য বটে যে, গীতিকাব্য-লেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে, নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য বক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অবক্তব্য তাহাতে গীতিকাব্যের অধিকার।"†

৩। পক্ষান্তরে রাজনীতিবেত্তা উৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালীর লক্ষণ স্থিরীকরণ প্রসঙ্গে 'উন্নতি কি' বুঝাইতেছেন ;—

"স্থায়িত্ব ও তদ্ভিন্ন আরও কিছু উন্নতির অন্তর্ভূত। * * * কোন বিষয়ের উন্নতির সহিত তদ্বিষয়ের স্থায়িত্ব স্বভাবতঃ সংশ্লিষ্ট। কোন বিষয় বিশেষের উন্নতির জন্য স্থায়িত্ব ধ্বংসীকৃত হইলে তৎসহিত অন্যান্য বিষয়ের উন্নতিরও ধ্বংস সংসাধিত হয়। পরন্তু এই ধ্বংসজনিত ক্ষতির তুলনায় প্রাগুক্ত উন্নতি যদি

* পদার্থবিজ্ঞান। প্রথম ভাগ। শ্রীকানাইলাল দে রায় বাহাদুর প্রণীত। ১৮৭৪।

† বিবিধ সমালোচন। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ১৮৭৬।

মূল্যহীন হয় তাহা হইলে এরূপ বুঝিতে হইবে যে, কেবল মাত্র স্থায়িত্ব উপেক্ষিত হয় নাই কিন্তু সাধারণ উন্নতি সম্বন্ধেও ভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল।

অপিচ শৃঙ্খলা উন্নতির অন্তর্গত। কিন্তু উন্নতি শৃঙ্খলার অন্তর্গত নহে: শৃঙ্খলা (order) যাহা অতি অল্প পরিমাণে সম্পাদন করে, উন্নতির দ্বারা তাহা অধিক পরিমাণে সম্পাদিত হয়। * * * উন্নতি সংসাধনার্থে শৃঙ্খলা অন্যতম উপায় মাত্র; কেননা সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি করিতে হইলে যে পরিমাণে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বর্ত্তমান আছে তাহার রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। ধনবৃদ্ধি করিতে হইলে যাহাতে সঞ্চিতধনের অপচয় না হয়, তাহাই করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। অতএব শৃঙ্খলা উন্নতির অংশ ও উপায়মাত্র। উন্নতির অনুরূপ উদ্দিষ্ট বিষয় নহে।"*

৪। অতঃপর দার্শনিক, তুলনা দ্বারা 'দর্শন' ও 'বিজ্ঞানের' প্রভেদ দেখাইতেছেন;—

"দর্শন বিজ্ঞানের অন্তর্গত নহে, এবং বিজ্ঞানও দর্শনের শাখা নহে। দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়ের মধ্যে নিগূঢ় ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও তাহারা স্বতন্ত্র। নীতি-বিজ্ঞান মনুষ্যের নৈতিক বা ধর্ম্মপ্রকৃতিগত ভাবসমূহের 'দৈর্ঘ প্রস্থ' পরিমাপ করে; পরন্তু নীতিদর্শন উক্ত ভাবনিচয়ের উচ্চতম ও গভীরতম স্থল নিহিত আভ্যন্তরিক সত্তার পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত। প্রকৃতিগত ভাবপরম্পরার একত্রীভূত অস্তিত্ব এবং পারস্পারিক আবির্ভাব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে যে সকল সাধারণ নিয়ম নিষ্কাসিত হয়, তাহারই আলোচনা করা বিজ্ঞানের অধিকার। বিজ্ঞান, ভাবপরম্পরার সংযোজনশৃঙ্খল ও তাহাদিগের অন্তস্তলনিহিত সারসত্তার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় না; কিন্তু দর্শন এতদুভয়েরই অনুসন্ধান দ্বারা সমগ্র নৈতিকপ্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য-নির্ণয়ের চেষ্টা করে। বিজ্ঞান এরূপ চেষ্টাকে বৃথা ও নিষ্ফল বলা সত্ত্বেও দর্শন উহা হইতে বিরত হয় না।" *

আমরা উপরে চারিখানি ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক হইতে চারিটী ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সমালোচনা যথাক্রমে উদ্ধৃত ও অনুবাদ করিয়াছি। প্রথমতঃ স্থিতির সহিত গতির তুলনা দ্বারা বৈজ্ঞানিক গতির সাধারণ লক্ষণ ও ধর্ম্ম বুঝাইলেন। স্থিতির 'স্থিতিত্ব' হেতুই গতির গতিত্ব, অতএব গতি কি বুঝিতে হইলে স্থিতির প্রকৃতি-অনুধাবনও আবশ্যক, সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধপর্য্যালোচনা করা অপরিহার্য্য।

দ্বিতীয়সমালোচনা' গীতিকাব্যের। সমালোচক গীতিকাব্য কি স্থির করিতে নাটক' ও মহাকাব্যের আংশিক স্বরূপ-নির্ণয় করিলেন। যেহেতু নাটক ও মহাকাব্য কি পদার্থ ইহা না বুঝিলে গীতিকাব্যের প্রকৃতি উৎকৃষ্টরূপে অনুভূত হয় না। গীতিকাব্য, মহাকাব্য ও নাটক তিনই কাব্য। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তিনেরই পারস্পারিক অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, অতএব একটীর লক্ষণ নিরূপণার্থে অবশিষ্ট দুইটীর সহিত তাহার সম্বন্ধনির্ব্বাচন করা অবশ্যম্ভাবী।

Considerations on Representative Government— by J. S. Mill.

*Ethical Philosophy and Evolution by Professor W. Knight.—Vide "The Nineteenth century." No19. Sept, 1878.

তৃতীয় উদাহরণ,—উন্নতি কাহাকে বলে? শুভ বা মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হওয়ার নাম উন্নতি ও তাহা হইতে বিচ্যুতির নাম অবনতি। উন্নতিসাধনার্থে অবনতিনিবারণ করা প্রথমাবশ্যক। অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বে যদ্দ্বারা পশ্চাৎপদ হওয়ার কারণ বিদূরিত হয় এমত বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। নতুবা প্রকৃতপ্রস্তাবে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। অগ্রসর হওয়া উন্নতি, পশ্চাৎপতন অবনতি। সুতরাং অবনতির কারণ সত্তে উন্নতি অসম্ভব। অস্থায়িত্ব ও বিশৃঙ্খলা অবনতির কারণ সুতরাং উন্নতির অন্তরায়। এক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলা ভিন্ন অস্থায়িত্ব ও বিশৃঙ্খলা অথবা অবনতি নিবারিত হওয়া অসম্ভব, সুতরাং উন্নতির সহিত স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলার অপরিহার্য্য ঘনিষ্ঠতা বর্ত্তমান। অতএব উন্নতি কি, ব্যাখ্যা করিতে স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলার সহিত তাহার যে সম্বন্ধ তাহা আলোচিত হইয়াছে।

পরন্তু চতুর্থ বা শেষোক্ত উদাহরণটীতে বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের তুলনা। উভয়ের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য ও পার্থক্যনির্ণয়। এই উদাহরণটী পূর্ব্বোক্ত উদাহরণত্রয়ের সম্পূর্ণ অনুরূপ; কেবল এই মাত্র বিভিন্নতা যে, ইহাতে সম্বন্ধনিরূপণার্থ স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, স্বরূপনির্ণয় ও সম্বন্ধনিরূপণ-প্রক্রিয়া পরস্পরে সম্বদ্ধ,—একটী অপরটীর অনুগামী অথবা একের সম্পাদনার্থে অপরের সাহায্য প্রয়োজন। উপরোক্ত প্রথম তিনটী উদাহরণে স্বরূপনির্ণয়ার্থে সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে, আর চতুর্থ উদাহরণে সম্বন্ধস্থিরীকরণ-উদ্দেশে স্বরূপের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ফলতঃ উভয় দিকেই প্রক্রিয়া একই প্রকার। স্বরূপনিরূপণার্থে যেমন সম্বন্ধের আলোচনা করা প্রয়োজন, সম্বন্ধনির্ণয়হেতু তেমনি স্বরূপের তত্ত্বানুসন্ধানের আবশ্যক। স্বভাবতই একটী কর্ত্তৃক অপরটী আকৃষ্ট হয়।

পারস্পারিক সম্বন্ধ হইতেই যাবতীয় পদার্থের বৈজ্ঞানিক শ্রেণিবিভাগ হইয়াছে, অতএব 'সম্বন্ধের' পর্য্যালোচনা দ্বারা আমরা সমালোচনার মৌলিক প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিব এবং তদ্দ্বারা সমালোচন-প্রক্রিয়া সাধারণতঃ যেরূপে সম্পাদিত হয় তাহাও কিয়ৎপরিমাণে দেখাইব।

পার্থক্য ও সাদৃশ্য সম্বন্ধেরই অন্তর্গত এবং বৈজ্ঞানিক শ্রেণী-বিভাগের ও জাতিনির্ব্বাচনের মূলভিত্তি। অপিচ পার্থক্য ও সাদৃশ্যানুভূতি হইতেই মনুষ্যজ্ঞানের প্রাথমিক বিকাশ। অতএব পদার্থগত অন্যান্য সম্বন্ধের উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে পার্থক্য ও সাদৃশ্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। বিশেষতঃ এই প্রবন্ধ যখন সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত, তখন মূলবিষয়ের অন্তর্গত ও আনুষঙ্গিক সকল কথাই যথাসম্ভব আমূল পর্য্যালোচিত হওয়া উচিত এবং তজ্জন্য যদি প্রস্তাবের 'অতিবিস্তৃতি' দোষও ঘটে তাহাও উপেক্ষণীয়।

(ক্রমশঃ)

ঠঃ দঃ মঃ।

শাস্ত্র-সমন্বয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

তর্ক ও অনুমানের দ্বারা ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনে ঈশ্বর নিরূপণ করিয়াছেন দেখিয়া কোন কোন নৈয়ায়িক মনে করেন যে, ঈশ্বর আছেন ইহা কেবল অনুমানসিদ্ধ এবং সেই অনুমান তর্কেতে প্রতিষ্ঠিত। সেই অনুমিত ঈশ্বরই শ্রুতিতে ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হয়েন। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ অনুমান-উপন্যাসকে না ব্যাসদেবই স্বীকার করিয়াছেন, না জৈমিনিই গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যাস অনুভবসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম মানিয়াছেন এবং তাবতীয় তর্কানুমানকে সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পোষক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। জৈমিনি কহিয়াছেন, "অনুমানশতৈরপি নেশ্বরসিদ্ধতি"। শত শত অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হন না। অতএব জৈমিনি কেবল আনুমানিক ঈশ্বর খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রুতিসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরকে তিনি খণ্ডন করেন নাই। তাদৃশ ঈশ্বরাস্তিত্বের বিষয়ে তিনি স্বীয় 'পূর্ব্ব মীমাংসায়' কোন উল্লেখ করেন নাই। কারণ ব্রহ্মজ্ঞানিদিগের অধিকার দৃষ্টিতে তিনি স্বীয় গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন নাই। কেবল কর্ম্মিদিগের উদ্দেশেই তাহা প্রচার করিয়াছিলেন। কর্ম্মীরা ঈশ্বর লইয়া কি করিবেন? তাঁহারা ফল চান। অতএব ঈশ্বরকে ফলদাতারূপে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তিনি কেবল বিধিবিহিত কর্ম্মেরই ফলদাতৃত্ব ও দেবত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কর্ম্মিগণ ক্রমে ক্রমে লব্ধফলের অনিত্যতা জানিয়া চিত্ত শুদ্ধিবশতঃ ঈশ্বরপরায়ণ হইবেন, এই তাঁহার উদ্দেশ্য। সাধকেরা তাদৃশ অধিকার হইতে উত্তীর্ণ হইলেই জৈমিনির উদ্দেশ্য সফল হইল। তখন তাঁহারা ব্যাসের প্রণীত অনুভবসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারে উপস্থিত হন।

এতাবতা বিধিপর কর্ম্ম যেমন ঈশ্বর-বোধবিহীন কর্ম্মিগণের অধিকার দৃষ্টিতে কেবল রাজাজ্ঞার ন্যায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, এবং তর্কপরায়ণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে যেমন অনুমিত ঈশ্বর নিরূপিত হইয়াছেন, সেইরূপ বিধিপ্রতিপালনরূপ দাসত্ব হইতে এবং তর্কবাদরূপ শুষ্কবিচার হইতে যাঁহারা পূর্ব্বের অথবা সম্প্রতিকার পুণ্যের দ্বারা উদ্ধার পাইয়াছেন, তাঁহাদিগের অধিকার দৃষ্টিতে অনুভবসিদ্ধ এবং ভক্তি, প্রেম ও জ্ঞানামৃতসিক্ত বৈদান্তিক প্রস্থানের প্রেরণা হইয়াছে। কেবল অধিকারের ভিন্নতা হেতু প্রস্থানভেদমাত্র। নতুবা স্বরূপতঃ মতভেদ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। সাংখ্যশাস্ত্র যে ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই, তাহাতেও দোষ হয় নাই। কেন না মহর্ষিকপিল ঔপাধিক ঈশ্বর অস্বীকারকরতঃ পুরুষের কৈবল্য মধ্যে মুক্তিস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রকারান্তরে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন এবং ব্যবহারিক অবস্থায় জগন্নির্ম্মানের উপযোগী সমস্ত ঐশ্বর্য্য ঐ পুরুষ ও প্রকৃতির যোগমধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং স্বতন্ত্র ঈশ্বর স্বীকার করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। "দ্বাসুপর্ণা কি না দ্বৌসুপর্ণৌ" পরস্পর সখ্যস্বরূপ জীব ও ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধই কপিলোক্ত পুরুষশব্দের বাচ্য। সৃষ্টিকর্তৃত্ব ও ফলদাতৃত্ব সম্বন্ধে ঐ